Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাধা সমূহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়শা ফারিয়া

রোলঃ 216021886

২৫ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যেসমস্ত বাধা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়শা ফারিয়া

রোলঃ 216021886

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যেসমস্ত বাধা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়শা ফারিয়া, আইডিঃ 216021886 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যেসমস্ত বাধা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৫ মে, ২০২৪ ইং

আয়শা ফারিয়া

আইডিঃ 216021886

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

আখিরাত বা মৃত্যু পরবর্তী জীবন 7

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যে সমস্ত বাঁধা সমূহ 8

শিরক 8

গীবত 9

গোপন গুনাহ 10

ক্রোধ বা রাগ 10

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাঁধা স্বরূপ ‘কুফর’ এর পরিচয় 11

নিফাক এর পরিচিতি ও প্রকারভেদ 14

কুফর এর মৌলিক প্রকারসমূহ 20

কুফর ও শিরক এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 21

বিভিন্ন কুফরি কথা ও কাজ 22

সমাজে প্রচলিত ১৬ টি কুফরি বাক্য সমূহ 27

সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক ও কুফরি 28

কুফর ও ইমান এর মধ্যে পার্থক্য 32

কুফরের কুফল ও পরিণতি 34

হাদিসের আলোকে কুফরি কর্ম বনাম কাফের ব্যক্তি 37

মানবজীবনে গুনাহের প্রভাব 46

কুরআনের আলোকে কাফের সম্প্রদায় এর কিছু দৃষ্টান্ত 67

কুফর এর শাস্তি থেকে নাজাতের উপায় 73

কাফের ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহন 90

বর্তমান সময়ের কিছু কুফরি কালাম ও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 92

ইমান মজবুতকরণের কিছু মাধ্যম 97

ইমান আনার পর অব্যাহত ভাবে কুফরিকারীর তাওবা..106

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভে করনীয় ও বর্জনীয়...107

কিছু আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা ,যা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বর্ণনা করেন 113

মুমিনদের গুনাবলি ও বৈশিষ্ট..124

পরিশিষ্ট কিছু আলোচনা ও নাসিহাত...127

তথ্যসূত্রঃ...131

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والصلام علي اشرف المرسلين،نبينا محمد، وعلي آله واصحابه اجمعين.

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার ,যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক, সালাত ও সালাম নাযিল হোক সমস্ত নবিসেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আরও সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার পরিবার পরিজন ও সাথি সঙ্গীদের উপর। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে তৈরি করেছেন। আর এই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মানব জীবনকে তিনি দুই ভাগে ভাগ করেছেন,একটি হল ইহকাল বা দুনিয়ার জীবন,আরেকটি হল পরকাল বা আখিরাত। এই দুনিয়ার ও আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জন এর জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদের কিছু বিধি নিষেধ দিয়েছেন,যদি আমরা সেগুলো মেনে চলতে পারি তবেই আমরা দুনিয়াতে সম্মানিত হওয়ার সাথে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে আখিরাতেও পুরষ্কার প্রদান করবেন। তবে যদি আমরা সেগুলো না মানি বা অস্বীকার করি তবেই তা আমাদের উভয় জগতের জন্য লাঞ্ছনা ,অসম্মান এবং কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই এখানে আমরা আলোচনা করব যে সমস্ত বিষয় সমূহ আমাদেরকে আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাঁধা প্রদান করে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ। আল্লাহর আদেশ অমান্য করার দ্বারা যে সমস্ত দুনিয়াবি শাস্তি,এর থেকে তাওবা করে কিভাবে রবের কাছে ফিরে আসা যায়,কিভাবে এসব বাঁধা সমূহ থেকে হেফাজতে থাকা যায় তা আমরা কোরআন ও হাদিসের আলোকে আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ।

আখিরাত বা মৃত্যু পরবর্তী জীবন

আখিরাত একটি আরবি ও ইসলামি শব্দ যেটির দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বোঝানো হয়।আখিরাতের মধ্যেও কয়েকটি পর্যায় রয়েছে,যেমন কবর, হাশর মিযান,পুলসিরাত,জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি।আখিরাতের জীবনের শুরু আছে, তবে শেষ নেই।আখিরাতে কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক বিষয়ের হিসাব নিকাশ নেয়া হবে। কেউ যদি সরিষা দানা পরিমাণ ভাল কাজ করে থাকে তবে সেটার ও বিনিময় দেয়া হবে ,কারো উপর সামান্যতম জুলুম করা হবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন;

‘নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছে,সৎ কাজ করেছে,সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত প্রদান করেছে ,তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান।তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।’[১]

‘তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর,যেদিন তোমাদের আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেককেই তার কর্মের ফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।’[২]

‘কিন্তু তারা নয় - যারা তাওবাহ করেছে, ঈমান আনয়ন করেছে ও সৎ কাজ করেছে; তারাতো জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের প্রতি কোন যুলম করা হবেনা ।‘[৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

‘সুতরাং সেদিন কেমন হবে ? যেদিন আমি তাদেরকে একত্রিত করব ,যাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং প্রত্যেককে তার অর্জিত কাজের প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে; এবং তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।’[৪]

‘যেদিন প্রত্যেকে সে যা ভাল আমল করেছে তা উপস্থিত পাবে এবং সে যা মন্দ কাজ করেছে তাও পাবে;’[৫]

বিপরীতমুখী অর্থে দুনিয়া ও আখিরাত শব্দের ব্যবহার বেশি প্রচলিত। তবে আখিরাত শব্দের

বিপরীতে পবিত্র কোরআনে দুনিয়ার জন্য ‘উলা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে এসেছে,

‘অতঃপর আল্লাহ তাঁকে আখিরাত (পরকাল) ও উলা (দুনিয়া)তে কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন।[৬]

আখিরাতের জীবন কে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।তাওহিদ ও রিসালাতের ন্যায় আখিরাতে বিশ্বাস রাখা ও মনে প্রাণে বিশ্বাস ও স্বীকার করা জরুরী।

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে যে সমস্ত বাঁধা সমূহ

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার জন্য আমাদের যেমন অনেক পথ রয়েছে,তেমনি আখিরাত বাধাগ্রস্থ হবে এমন সব বিষয়ও রয়েছে যা নিয়ে এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হবে ইন শা আল্লাহ।

শিরক

শিরক শব্দের অর্থ অংশীদারিত্ব,অংশীবাদ,মিলানো,সমকক্ষ করা,শরিক করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের ভাষায় আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কাউকে শরিক করাকে শিরক বলে।

শিরক ২ প্রকার

১.শিরকে আকবর বা বড় শিরক

২ শিরকে আসগর বা ছোট শিরক

ক। শিরকে আকবর

শিরকে আকবড় বা বড় শিরক যা মানুষকে ইসলামের গন্ডী থেকে বের করে দেয় ।বান্দা যদি শিরকে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মারা যায় এবং তাওবা না করে তবে সে চিরস্থায়ি জাহান্নামি হবে।

খ। শিরকে আসগর

শিরকে আসগর বান্দাকে ইসলাম এর গন্ডী থেকে বের করে দেয় না তবে তার একত্ববাদের আকিদায় ত্রুটি ও কমতি তৈরি করে ।

গীবত

'গীবত' (الغِيْبَةُ) আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হ'ল- পরনিন্দা করা, দোষচর্চা করা, কুৎসা রটনা, পেছনে সমালোচনা করা, দোষারোপ করা, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলো অন্যের সামনে তুলে ধরা।

ইয়াহইয়া ইবনু আইউব, কুতায়বা ও ইবনু হুজর (রহঃ) ...

''আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কি জান, গীবত কী জিনিস? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, (গীবত হল) তোমার ভাই এর সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হল, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাই এর মধ্যে থেকে থাকে তবে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পর্কে যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তা হলে তো তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে।''[৭]

ইসলামে গিবত বা পরনিন্দা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ। গিবতের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে,যথা জিহবা দ্বারা গিবত,অন্তরের গিবত,ইশারা ইঙ্গিত এর গিবত এবং লেখার দ্বারা গিবত।

গোপন গুনাহ

মানুষের একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট হল মানুষ তাঁর নিজের করা মন্দ কাজ কে ঢেকে রাখতে চায় বা গোপন রাখতে চায়। ।আল্লাহর মুমিন বান্দাদের কিছু কিছু বান্দা আছেন যারা শয়তানের ,নিজের নফসের ধোকায় পড়ে গোপনে অনেক গুনাহে জড়িত হয়ে পরেন।যার দরুন তা তার দুনিয়া আখিরাতের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে থাকে।তবে ধোকায় পরে করা এই গুনাহ গুলো কে যেন আমরা কখনোই সু সজ্জিত না করি।পাপকে পাপ মনে না করাটা অনেক বড় গুনাহের এবং আফসোসের বিষয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন;

'বলো, তোমরা তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা যদি গোপন কর বা প্রকাশ কর,আল্লাহ তা অবগত।আর আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন,আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[৮]

ক্রোধ বা রাগ

ক্রোধ বা রাগ এমন একটি স্বভাব যা মানুষের জীবন ভয়াবহ আকার ধারন করতে পারে,একে অপরের মাঝে সম্পর্ক বিচ্ছেদ,একজন মানুষকে করে তুলতে পারে হত্যাকারী।রাগকে দমন করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত জরুরী।কেননা এক হাদিসে এসেছে;

'আবু কুরায়ব রাহ.......আবু হুরায়রা রাদি থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ [সা] বলেছেন; এক ব্যক্তি নবি [সা] এর কাছে এসে বলল;আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন;আমার জন্য যেন তা বেশি না হয়ে যায়।আমি যেন তা আত্যস্থ করতে পারি।তিনি বলেন;রাগ করবে না।লোকটি তার প্রশ্নের কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল।প্রতিবারই নবি [সা] বললেন ;রাগ করবে না'

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাঁধা স্বরূপ 'কুফর' এর পরিচয়

কুফর একটি আরবি শব্দ।শাব্দিক অর্থ হল আচ্ছাদন করা ও গোপন করা,অবিশ্বাস ,অস্বীকার ,অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি।

কুফরের পারিভাষিক সংজ্ঞা হল;

শরিয়তের পরিভাষায় ইমানের বিপরিতকে কুফর বলা হয়।কেননা কুফর বলা হয় আল্লাহ ও তার রাসুলগণের প্রতি ইমান না আনা ,এর সাথে মিথ্যা প্রতিপন্য করা থাক বা না থাক।বরং সন্দেহ বশত হোক বা উপেক্ষা করুক বা হিংসা বা অহংকার বশত হোক,কিংবা রিসালাতে অনুসরন করা থেকে বাঁধা প্রদানকারী প্রবৃত্তির অনুসরন,এ সমস্ত যাই হোক সবই কুফর।যদিও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কুফরি করার দিক দিয়ে বড়।

কুফর শব্দের উৎপত্তি;

৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও অভিধান প্রণেতা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনু ফারিস (৩৯৫হি) বলেন: ‘‘(কাফ, রা ও ফা) তিন অক্ষরের ক্রিয়ামূলটি একটি বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে, দিয়ে আবৃত করেন তবে বলা হয় তিনি তার বর্ম 'কুফর' করেছেন। চাষীকে 'কাফির' (আবৃতকারী) বলা হয়, কারণ তিনি শষ্যদানাকে মাটি দ্বারা আবৃত করেন। ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত অবিশ্বাসকে 'কুফর' বলা হয়; কারণ অবিশ্বাস অর্থ সত্যকে অবৃত করা। অকৃতজ্ঞতা বা নিয়ামত অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়; কারণ এতে নিয়ামত লুকানো হয় এবং আবৃত করা হয়।’’ [ইসলামি আকিদা]

কুফর এর প্রকারভেদ

কুফর প্রধানত দুই প্রকার। ১।কুফরে আকবর বা বড় কুফর ২।কুফরে আসগর বা ছোট কুফর

ক। কুফরে আকবর

কুফরে আকবর বা বড় কুফর মানুষকে ইসলামি মিল্লাত হতে বের করে দেয়।তা আবার পাচ ভাগে বিভক্ত,যথাঃ

১। কুফরে তাকযীব বা মিথ্যা প্রতিপন্নের মাধ্যমে কুফরি।

কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অর্থাৎ যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে ,তার কি স্মরণ রাখা উচিত নয় যে,জাহান্নাম সে সব কাফেরের ঠিকানা হবে '[৯]

'আর যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শন সমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে ,তারাই জাহান্নামের অধিবাসি;তারা সেকাহ্নে চিরকাল থাকবে।'[১০]

২। কুফরে ইসতিকবার বা সত্যকে জানা সত্ত্বেও অহংকার ও অস্বীকারের মাধ্যমে কুফরি করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

''অর্থাৎ এবং যখন আমি আদম [আ] কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগনকে নির্দেশ দিলাম,তখন ইবলিশ ব্যতিত সবাই সিজদা করল।সে [নির্দেশ] পালন করতে অস্বীকার করলএবং অহংকার প্রদর্শন করল।ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।'[১১]

'অতঃপর অবশ্যই তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যখনি তা তাদের নিকট এসেছে।অতএব শিগগির তাদের নিকট সেই সংবাদ আসবে যার প্রতি তারা উপহাস করত।'[১১]

৩।কুফরে শাক্ক বা সন্দেহের মাধ্যমে কুফরি।তা হল ধারনার কুফরি।

প্রমান হিসেবে ,আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘অর্থাৎ নিজের প্রতি যুলুম করে সে বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল,আমার মনে হয় না যে এ বাগান কখন ধ্বংস হবে এবং আমি মনে করি না যে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।যদি খন আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌছে দেয়া হয় তবে সেখানে এর চেয়ে উত্তম পাব,তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল,তুমি তাকে অস্বীকার করছ ?যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে অতঃপর বীর্য থেকে অতঃপর পূর্ণাজ্ঞ করেছেন তোমাকে মানব আকৃতিতে কারন আমি তোএকথাই বলি আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবঙ্গ আমি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরিক করি না।’[১২]

৪।কুফর ইরাজ বা মুখ ফিরিয়ে নেয়ার দ্বারা কুফরি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘অর্থাৎ আর কাফিররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে,তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।’[১৩]

‘যখনই তাদের নিকট তাদের রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন আসে ,তারা তা থেকে বিমুখ হয়।’[১৪]

৫।কুফরে নিফাক বা মুনাফিকির মাধ্যমে কুফরি করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘এটা এজন্য যে তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফির হয়ে গেছে ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে ।অতঃপর তারা বুঝে না।’[১৫]

[ইসলামি আকিদা আই ও এম সংকলিত]

অন্তরে অবিশ্বাস লুকিয়ে রেখে মুখে ঈমানের দাবি করাকে কুফরু নিফাক বলে। নিফাক বা মুনাফিকী কুফর এর একটি বিশেষ দিক যা কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। তাই নিফাক নিয়ে আমাদের পরবর্তী আলোচনা।

নিফাক এর পরিচিতি ও প্রকারভেদ

কুফরের একটি প্রকার হল কুফরুন নিফাক বা মুনাফিকির কুফরি।আরবিতে নিফাক শব্দের অর্থ কপটতা।শব্দটির মূল অর্থ খরচ করা,চালু করা ,গোপন করা ,স্পষ্ট করা ইত্যাদি।নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তিকে মুনাফেক বলা হয়।ইসলামী পরিভাষায় নিফাক দুই প্রকার: (১) বিশ্বাসের নিফাক ও (২) কর্মের নিফাক।

১. বিশ্বাসের নিফাক (النفاق الاعتقادي)

অন্তরের মধ্যে অবিশ্বাস গোপন রেখে মুখে বিশ্বাসের প্রকাশকে বিশ্বাসের নিফাক বা নিফাক ই'তিকাদী বলা হয়। এরূপ নিফাকের স্বরূপ নিম্নরূপ: (১) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সকল শিক্ষা বা দাও'আত বা তাঁর শিক্ষার কোনো দিককে মিথ্যা বলে মনে করা, (২) তাঁকে ঘৃণা করা বা তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা (৩) তাঁর কোনো শিক্ষাকে ঘৃণা করা, (৪) তাঁর দীনের অবমাননায় আনন্দিত হওয়া অথবা (৫) তাঁর দীনের সাহায্য করতে অপছন্দ করা। মূলত কুরআন-হাদীসে এরূপ নিফাকের কথাই বলা হয়েছে। এরূপ নিফাক কুফরেরই একটি প্রকার; কারণ এরূপ নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তির অন্তরে অন্যান্য কাফিরের মতই অবিশ্বাস বিদ্যমান, যদিও সে জাগতিক স্বার্থে মুখে ঈমানের দাবি করে। এদের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

''তা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেওয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হরিয়ে ফেলেছে।''[১৬]

২. কর্মের নিফাক (النفاق العملي)

আমরা জানি যে, বিশ্বাসই মানুষের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাহ্যিক কর্ম মানুষের আভ্যন্তরীন বিশ্বাসের প্রতিফলন। যার অন্তরে বিশ্বাস নেই কিন্তু বাইরে বিশ্বাস দাবি করে স্বভাবতই তার অন্তরের অবিশ্বাস তার কর্মে প্রকাশিত হয়, যেগুলি প্রমাণ করে যে, সে ঈমান ও তাকওয়ার দাবি করলেও বস্তুত তার মধ্যে ঈমান ও তাকওয়া অনুপস্থিত। হাদীস শরীফে এ জাতীয় কিছু কর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

''চারটি বিষয় যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলির মধ্য থেকে কোনো একটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি দিক বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে: (১) যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় সে তা খিয়ানত করে, (২) যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, (৩) যখন সে

চুক্তি বা প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন সে ঝগড়া করে তখন সে অশ্লীল কথা বলে।”[১৭]

এ সকল কর্ম বাহ্যত অন্তরে বিশ্বাসের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে। তবে যদি অন্তরে প্রকৃত অবিশ্বাস না থাকে তবে এ সকল কর্ম ‘কুফর’ বা অবিশ্বাসের নিফাক বলে গণ্য হবে না। বরং কুফর আসগারের ন্যায় নিফাক আমালী বা কর্মের নিফাক বলে গণ্য হবে।

এছাড়াও রয়েছে নাম ও গুনাবলির একত্বে অবিশ্বাস।

আল্লাহ তা‘আলার নাম ও গুণাবলির কিছু বা সব অস্বীকার করা এ পর্যায়ের কুফর। এ কুফর দু প্রকারের:

প্রথমত: কুফরুন নাফই (كفر النفي) **বা অস্বীকারের কুফর**

এর অর্থ আল্লাহ যে সকল নাম ও গুণ তাঁর আছে বলে জানিয়েছেন তার সব বা যে কোনো একটি অবিশ্বাস বা অস্কীকার করা। যেমন আল্লাহর ইলম (জ্ঞান), কুদরত (ক্ষমতা), কালাম (কথা), রাহমাত... ইত্যাদি যে কোনো এক বা একাধিক নাম বা গুণ অস্বীকার করা, বা তার পূর্ণতা অস্বীকার করা। আল্লাহর কোনো কর্ম বা গুণ তার সৃষ্টির মত বা তুলনীয় বলে বিশ্বাস করাও একই পর্যায়ের কুফর বা অবিশ্বাস।

দ্বিতীয়ত: কুফরুল ইসবাত (كفر الإثبات) **বা দাবির কুফর**

এর অর্থ আল্লাহ নিজের জন্য যা অস্বীকার করেছেন তাঁর তা আছে বলে দাবি করা। যেমন আল্লাহর জন্য ঘুম, তন্দ্রা, সন্তান, স্ত্রী ... ইত্যাদি দাবি করা।

আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য যে সকল বিশেষণ, গুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, কেউ যদি নিজের জন্য বা অন্য কোনো সৃষ্টির জন্য সে সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে এক বা একাধিক গুণ বা বিশেষণ দাবি করে তবে তাও এ প্রকারের কুফরী বলে গণ্য হবে। যেমন আল্লাহর মত ইলম, হিকমত, রহমত... ইত্যাদি অন্য কারো আছে বলে দাবি করা। এরূপ দাবি স্বীকার বা বিশ্বাস করাও একইরূপ কুফর।

সন্তুষ্টি ও অসুন্তুষ্টির কুফর

(ক) আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অপছন্দ করা বা আল্লাহর যিকর, কুরআন, ইসলাম বা ইসলামের বিধান বলে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কোনো কিছুর প্রতি বিরক্তি বা ঘৃণা পোষণ করা, ইসলামের কোনো নির্দেশ বা শিক্ষা অচল, সেকেলে বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা। মহান আল্লাহ বলেন:

“যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।”[১৮]

(খ) ইসলামের কোনো প্রমাণিত বিষয় নিয়ে হাসি-তামাশা, মস্করা বা উপহাস করা অথবা যার এরূপ করে তাদের সাথে অবস্থান করা বা তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা। মহান আল্লাহ বলেন:

“তুমি যখন দেখ, তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসংগে প্রবৃত্ত হয়। এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে জালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।”[১৯]

‘এভাবে তারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, অচিরেই তার প্রকৃত সংবাদ তাদের কাছে এসে যাবে।‘[২০]

(খ) মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের, যারা সুস্পষ্টভাবে ঈমানের কোনো রূকন বা কুরআন-হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট বিষয় অস্বীকার করেছে, আপত্তিকর বলে বিশ্বাস করেছে বা উপহাস করেছে, যাদের কুফর সন্দেহাতীতভাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত এবং যাদের কুফর-এর বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম একমত পোষণ করেছেন তাদেরকে কাফির বলতে অস্বীকার করা, কাফির বলে গণ্য না করা, তাদেরকে কাফির বলতে সন্দেহ বা দ্বিধা করা। অথবা এরূপ কাফিরগণকে আন্তরিক বন্ধু, সহযোগী ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা। তবে তাদের সাথে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক রাখা ও মানবীয় সহযোগিতা নিষিদ্ধ নয়।

কুরআনে এ বিষয়ে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

“মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর।‘[২১]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

“হে মুমিনগণ, মুমিনগণের পরিবর্তে কাফিরগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?”[২২]

অন্যত্র তিনি বলেন:

“হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হয়ে যাবে। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।”[২৩]

তিনি আরো বলেন:

“হে মুমিনগণ, তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে এবং কাফিরদেরকে তোমারা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং তোমরা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহকে ভয় কর।”[২৪]

তিনি আরো বলেন:

“হে মুমিনগণ, তোমাদের পিতাগণ ও ভ্রাতাগণ যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরিকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে তারাই জালিম।”[২৫]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:

“মুনাফিকগণকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে! মুমিনগণের পরিবর্তে যারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের নিকট ইয্যত-ক্ষমতা চায়? সমস্ত ইয্যত-ক্ষমতা তো আল্লাহরই। কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তার প্রতি বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন, যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসবে না। অন্যথায় তোমরাও

তাদের মতই হবে। মুনাফিক ও কাফির সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে একত্রিত করবেন।''[২৬]

অন্যত্র বলা হয়েছে:

''তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধচারিগণকে, হোক না কেন এ সকল বিরুদ্ধচারী তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র।''[২৭]

অন্যত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন:''দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং তোমারেদকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করে নি তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।''[২৮]

(গ) ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা বিশ্বাসের অনুসরণ করে কেউ মুক্তিলাভ করতে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে বা আখেরাতে জান্নাত লাভ করতে পারে বলে মনে করা। মহান আল্লাহ বলেন:

''ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।''[২৯]

''কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।''[৩০]

খ] কুফরে আসগর

ছোট কুফর যা মানুষকে ইসলামের মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না ।এই কুফরি কাজের দ্বারা সংঘঠিত হয়।এই কুফরি ঐ সমস্ত পাপকে বলা হয় যার নাম কুরআন ও সুন্নাহ এ কুফরি নামে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু তা বড় কুফরির সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না।যথা,

১। নিয়ামত সমূহের কুফরি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘আল্লাহ পাক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিনহ,তথায় প্রত্যেক তথায় প্রত্যেক জায়গায় আসত জীবনপোকরণ ।অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।’[৩১]

২। মুসলমানের প্রতি অস্ত্র ধারন করা।

হাদিসে এসেছে,

রাসুল [স] বলেছেন,’ অর্থাৎ কোনো মুসলমানকে গাল্লি দেয়া ফাসিকি কাজ আর তার সাথে লড়াই করা কুফরি।’[৩২]

নবিজি আরো বলেন,’ অর্থাৎ তোমার আমার মৃত্যুর পর এমন কুফরিতে ফিরে যেও না ,যার দরূন তোমরা পরস্পরের গর্দান উড়িয়ে দিবে।’[৩৩]

৩। আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নামে শপথ করা।

নবিজি [সা] বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের কসম করল ,সে ব্যক্তি কুফরি করল অথবা শিরক করল।’[৩৪[

এ বিষয়ে মহা পাপে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। [ইসলামি আকিদা]

কুফর এর মৌলিক প্রকারসমূহ

কুফরের মৌলিক প্রকারসমূহকে পাচ ভাগে বিভক্ত করা হয়।তা নিয়ে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল;

১. কুফরে ইনকারঃ 'জরুরিয়াতে দ্বীন'কে অন্তরেও বিশ্বাস না করা, মুখেও স্বীকারোক্তি প্রদান না করা। যেমনটা সাধারণ কাফিরদের অবস্থা।

২. কুফরে জুহুদঃ অন্তরে 'জরুরিয়াতে দ্বীনে'র প্রতি বিশ্বাস রাখা, কিন্তু মুখে তার স্বীকারোক্তি না দেয়া। ইবলিস-শয়তানের কুফর এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। রাসুলের যুগের অনেক আহলে কিতাবের অবস্থাও ছিলো এমন।

৩. কুফরে ইনাদঃ অন্তরে 'জরুরিয়াতে দ্বীনের' প্রতি বিশ্বাস রাখে, মুখেও স্বীকার করে; কিন্তু অন্য কোনো কুফরি ধর্ম মতবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে না, বরং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা কুফরি মতবাদকেও সঠিক মনে করে। রাসুলুল্লাহ সা. এর চাচা আবু তালিবের অবস্থাও এমন ছিলো। বর্তমান সময়ে যারা কুফরি তন্ত্রে-মন্ত্রে, বাদ-মতবাদে বিশ্বাসী, তাদের কুফরও এই পর্যায়ভুক্ত।

৪. কুফরে নিফাকঃ অন্তরে 'জরুরিয়াতে দ্বীনে'র প্রতি বিশ্বাস রাখে না, কিন্তু কোনো হেকমত-মাসলাহাত বা দুনিয়াবি স্বার্থসিদ্ধির মানসে মুখে ইমানের ঘোষণা দেয়। এমন কাফিরকে মুনাফিক বলা হয়। মুনাফিক সাধারণ কাফিরের চেয়ে বহুগুণে নিকৃষ্ট।

৫. কুফরে যানদাকাহ বা কুফরে ইলহাদঃ এটা গোপন কুফর। কেননা এই পাপে পাপী বাহ্যত সকল 'জরুরিয়াতে দ্বীনে'র প্রতি ইমান প্রকাশ করে, তার বাহ্যিক সুরত-লেবাস দেখলে তাকে মুমিন-মুসলিম, এমনকি মৌলবিও মনে হয়। কিন্তু সে 'জরুরিয়াতে দ্বীনে'র অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে, যা দ্বীনের অকাট্য ব্যাখ্যা, সেই বিষয়ের স্বীকৃত দ্বীনি ব্যাখ্যার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। কাদিয়ানিদেরকে মুলহিদ-যিন্দিক-কাফির বলার পেছনে অন্যতম কারণ এটাও। বর্তমানকালে এই কুফরের চর্চা খুব ব্যাপক। [সংগৃহীত ;আলি হাসান উসামা]

কুফর ও শিরক এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

কুফর ও শিরক সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই সংক্ষিপ্ত ভাবে জেনেছি।এখন আমরা এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে জানব ইন শা আল্লাহু তায়ালা।

প্রথমত, কুফর ও শিরক পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কাউকে কোনোভাবে কোনো বিষয়ে মহান আল্লাহর সমকক্ষ বা তুলনীয় মনে করার অর্থই তাঁর একত্বে অবিশ্বাস বা কুফরী করা। আল্লাহর তাওহীদ ও রাসূলগণের দাও'আতে অবিশ্বাস না করে কেউ শির্ক করতে পারে না। কাজেই শি্রকের অর্থই তাওহীদ ও রিসালাতে অবিশ্বাস করা। অপরদিকে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ না মেনে ঈমানের কোনো রুকন অবিশ্বাস করলে তা শুধু কুফর বলে গণ্য। যেমন যদি কেউ আল্লাহর অস্তিত্বে বা তাঁর প্রতিপালনের একত্বে অবিস্বাস করেন বা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাত, খাতমুন নুবুওয়াত ইত্যাদি অস্বীকার করেন তবে তা কুফর হলেও বাহ্যত তা শিরক নয়। কারণ এরূপ ব্যক্তি সুস্পষ্ট কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় বলে দাবি করছে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ কুফরের সাথেও শিরক জড়িত। কারণ এরূপ ব্যক্তি কোনো না কোনোভাবে এ ক্ষয়িষ্ণু জড় বিশ্বকে মহান আল্লাহ মত অনাদি-অনন্ত বলে বিশ্বাস করছে, বিশ্ব পরিচালনায় প্রকৃতি বা অন্য কোনো শক্তিকে বিশ্বাস করছে।

দ্বিতীয়ত, কুফর বা অবিশ্বাসের অন্যতম প্রকাশ শিরক। সাধারণভাবে যুগে যুগে অবিশ্বাসীগণ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবালি বা তাঁর মা'বুদিয়্যাত বা উপাস্যত্ব অস্বীকার করে কুফরী করে নি, বরং এগুলিতে তার সাথে অন্য কাউকে শরীক বা অংশীদার বলে বিশ্বাস করেই কুফরী করেছে। এজন্য কুরআন ও হাদীসে কুফরের বর্ণনায় শিরকের কথাই বেশি বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত, মহান আল্লাহর কোনো সমকক্ষ কল্পনা করা বা শিরকের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা বুঝতে পারি যে, দুভাবে শিরক হয়ে থাকে: (১) মহান আল্লাহর কোনো সৃষ্টির প্রতি অতি-সুধারণা অথবা (২) মহান আল্লাহর প্রতি কু-ধারণা বা অব-ধারণা।

শিরকে নিপতিত মানুষেরা কখনো ফিরিশতা, নবী, ওলী, নেককার মানুষ, কারামত-প্রাপ্ত মানুষ, তাদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান, পাহাড়, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি কোনো সৃষ্টির বিষয়ে ভক্তি ও মর্যাদা প্রদানে অতিরঞ্জন করে তাদের মধ্যে 'অলৌকিক শক্তি' বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা কল্পনা করেছে। অথবা মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে তাকে সৃষ্টির মত কল্পনা করেছে এবং তাঁর সন্তান, পরিষদ, ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কল্পনা করেছে।

কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত শিরক এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির শিরক পর্যালোচনা করলে আমরা মূলত এ দুটি বিষয়ই দেখতে পাই। এবং এদুটি বিষয়ও পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কারো প্রতি ভক্তির অতিরঞ্জর অর্থই আল্লাহর ক্ষমতা, রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা।

বিভিন্ন কুফরি কথা ও কাজ

কুফরি কথা বা কাজ

১. কেউ গোনাহকে বিদ্রুপবশত হালাল জেনে করলে : 'যখন তুমি দেখো আমার আয়াত নিয়ে তারা উপহাসপূর্ণ আলোচনা করছে তখন তাদের থেকে সরে পড়ো, যে পর্যন্ত তারা অন্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়। আর যখন শয়তান তোমাকে (আল্লাহর এই নসিহত) ভুলিয়ে দেয় তখন স্মরণ হয়ে গেলেই জালিম সম্প্রদায়ের সাথে আর বসবে না' [৩৫]

'কেউ যদি গোনাহের কাজ আরম্ভ করে নিজের সঙ্গী-সাথীদের বলে, এসো! আমরা আমোদ ফুর্তি করি। তাহলে এ কথা কুফরি কালাম বলে গণ্য হবে'[৩৬] 'উল্লাস ও গানের ধ্বনি হৃদয়ে কপটতা বৃদ্ধি করে যেমন পানি গাছপালা বৃদ্ধি করে। আমি বললাম, আল-বাজাজিয়ায় বিনোদন পার্কের শব্দ শোনা যেত বেত মারার মতো এবং এটি হারাম। কেননা, রাসূল সা: ইরশাদ ফরমান, 'গানবাদ্যের আওয়াজ শোনা পাপ, সেসব বৈঠকে বসা ফাসেকি ও তা থেকে স্বাদ উপভোগ, উল্লাস এবং আনন্দ করা কুফরি' [৩৬]

২. ঠাট্টা ও কৌতুকচ্ছলে কুরআনের কোনো আয়াত উল্লেখ করলে : 'কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে বলে, তুমি তো 'কুলহু আল্লাহ'-এর খাল ছিলে ফেলেছ অথবা 'আলাম নাশরাহ'-এর আঁচল টেনে ধরেছ অথবা কোনো অসুস্থ ব্যক্তির সামনে যে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করছে তাকে কেউ বলল মৃত ব্যক্তির মুখের ওপর সূরা ইয়াসিন রাখবে না অথবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, হে 'ইন্না আ'তয়নাকা' সূরার চেয়েও অধিক বেটে ব্যক্তি, অথবা কুরআন তিলাওয়াতকারী কোনো ব্যক্তি যার একটি শব্দ মনে আসছে না তাকে উদ্দেশ্য করে অপর ব্যক্তি বলল ওয়ালতাফাতিস সাকু বিসাকি অথবা পেয়ালা ভরে কোনো ব্যক্তির নিকট এনে বলল 'ওয়া কা-ছান দিহাকা' ঠাট্টাচ্ছলে, 'ফা কানাত ছাসারা' অথবা পরিমাপের কৌতুকের

সাথে বলল ‘ওয়া ইজা কালুহুম আওয়াজানুহুম ইয়াখছিরুন’ অথবা কেউ অপর কোনো ব্যক্তিকে বলল তুমি ‘আলাম নাশরাহ’-এর পাগড়ি বেঁধেছ অর্থাৎ তুমি নিজ ইলমকে জাহির করেছ অথবা কোনো জায়গায় লোকদের জমায়েত করে বলল ‘ফাজআলনাহুম জামআ’ বা বলল ‘ওয়া হাশারনাহুম ফালা নুগাদিরহুম’ অথবা এক ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে বলল ‘ওয়ান নাজিয়াতি নাজআ’-এর ‘আইন’কে যবরের সাথে পড়ো না পেশের সাথে পড়ো?

উদ্দেশ্য হলো তিলাওয়াতকারীকে ভর্ৎসনা করা অথবা কেউ কোনো ব্যক্তিকে বলল তুমি পড়ো আমি তোমাকে গালমন্দ করব, কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ‘কাল্লা বাল রা-না’ অথবা কাউকে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য ডাকায় বলল আমি একাই সালাত আদাই করব কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ‘ইন্নাস সালাতা’ অথবা কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল ‘তাফশিলিহি ইয়াজুযু’ (হীনবল হওয়া জায়েজ) কেননা এটি বাতাসের সাথে উড়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ‘ওয়ালা তানাজাযু ফাতাফশালু’ তাহলে উপরোক্ত অবস্থানগুলোকে সব ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে। [৩৭]

৩. কিয়ামতকে নিয়ে বিদ্রুপ করলে :‘ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতাকে বলল- যদি এখন না দাও কিয়ামতে অবশ্যই দিতে হবে। এ কথা শুনে গ্রহীতা বলল- কিয়ামত কী হবে? তাচ্ছিল্যের নিয়তে বললে কুফরি হবে। মজলুম ব্যক্তি জালিমকে বলল- ঠিক আছে কিয়ামত তো আছেই, এ কথা শুনে জালিম বলল- (তাচ্ছিল্যের সাথে) কিয়ামতে অমুক গাধা হবে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।[৩৮]

৪. বংশের প্রতি কটাক্ষ ও কারো মৃত্যুর পর বিলাপ করা : ‘হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, দুটো স্বভাব মানুষের মাঝে রয়েছে, যা কুফর বলে গণ্য। বংশের প্রতি কটাক্ষ করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করা’ [৩৯]

৫. আপন পিতার সম্পর্ক ছিন্নকারী : ‘হজরত আবু হুরায়রা রা: সূত্রে নবী সা: হতে বর্ণিত- তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (অস্বীকার করো না)। কারণ যে লোক নিজের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (পিতাকে অস্বীকার করে) অতঃপর সে কুফরি করল।[৪০]

৬. বিদ্রুপ করে সগিরা গোনাহ করলে : ‘এক ব্যক্তি সগিরা গোনাহ করায় তাকে বলা হলো তুমি এই গোনাহ থেকে আল্লাহর কাছে তওবা করো। সে বলল, আমি কী করেছি যে তওবা করব? অথবা বলল, আমার এই সামান্য কাজের জন্য তওবা? তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে’।[৪১]

৭. কোনো পয়গম্বরকে অস্বীকার, সুন্নতকে অবজ্ঞাভরে অপছন্দ করলে : ‘কেউ যদি এক নবীগণকে স্বীকার না করে অথবা নবী রাসূলগণের কোনো একটি সুন্নতকে অপছন্দ করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে’। [৪২]

‘মারিফাতের পর নবীদের প্রতি ইমান থাকা আবশ্যক। একজন নবী মানে মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বার্তাবাহক। তাঁর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা এবং তিনি মহান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যা বলেছেন তার প্রতি তাঁর বিশ্বাস রাখা। হজরত মুহাম্মদ সা:-এর প্রতি বিশ্বাস রাখা। তাই যদি কেউ বিশ্বাস করে থাকে তিনি একজন রাসূল তাহলে অবশ্যই আমাদের উচিত রাসূল সা: এবং নবী-রাসূলদের মধ্যে তাঁকে সর্বশষ বলে বিশ্বাস করা। আর যে তাঁকে শেষ নবী বলে বিশ্বাস করেনি সে কখনো ঈমানদার হতে পারে না। যে কেউ নবীগণের কোনো কিছু সম্পর্কে স্বীকার করে না অথবা সে রাসূলগণের কোনো একটি সুন্নতকে অপছন্দ বা অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে’[৪৩]

৮. খঞ্জনী, বাঁশি, হারমোনিয়াম ও গ্রামোফোন বাজিয়ে কুরআন তিলাওয়াত বা এসব কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ‘কিতাবে তোমাদের নিকট তিনি নাজিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতের প্রতি কুফরি হচ্ছে এবং তার প্রতি ঠাট্টা করা হচ্ছে, তখন তাদের নিকট বসো না, যে পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত না হয়, নচেৎ তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সবাইকেই জাহান্নামে একত্র করবেন’ ।[৪৪]

ঠাট্টা করে বলাকে আমরা মোটেই আমলে নিই না। অথচ পবিত্র কুরআনের আয়াত বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে, গানের আসরে বা বাঁশি, হারমোনিয়াম বাজিয়ে বাজিয়ে নেচে নেচে সুর দিচ্ছে। আবার কেউ আছেন বাঁশি, হারমোনিয়াম না থাকা সত্ত্বেও সেসব সুরের তালে পবিত্র কালামে পাক তিলাওয়াত করছেন, যা অবশ্যই কুফরির পর্যায়ে পড়ে। যারা এসব বৈঠকে বসবে তারাও গোনাহগার হিসেবে গণ্য হবে। ফতোয়ার ভাষায়- ‘কেউ যদি বাদ্যযন্ত্র ও বাশুরীর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে’[৪৫]

‘কুফরি কাজ হচ্ছে- প্রতিমা, সূর্য, চন্দ্রকে সিজদা করা, কুরআনুল কারিমকে ময়লায় নিক্ষেপ করা, জাদু; যে জাদুতে সূর্যের পূজা জড়িয়ে আছে, প্রতিমার জন্য পশু জবাই করা, কটাক্ষ

করা আল্লাহ তায়ালার নামসমূহের নামে, অথবা তার আদেশে বা তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, অথবা বাদ্যযন্ত্র ও বাশুরীর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা' [৪৬]

'কুরআনের কোনো আয়াতকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করলে কাফির হবে কি-না তা নিয়ে মতভেদ আছে। সহিহ মত হচ্ছে- লোকটি যদি আলিম না হয় তাহলে কাফির হয়ে যাবে, আলিম হলে শপথের কাফফারা আদায় করতে হবে, আর বাদ্যযন্ত্র ও বাশুরীর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা হলে কুফরি হবে'।[৪৭]

৯। কোনো কিছুকে কুলক্ষণ মনে করা : কোনো বস্তু বা অবস্থা থেকে কুলক্ষণ গ্রহণ করা বা কোনো সময়, দিন বা মাসকে অমঙ্গল মনে করা ভ্রান্ত বিশ্বাস। কোরআন-হাদিসে প্রমাণিত নয় এরূপ কোনো লক্ষণে বিশ্বাস করা ভ্রান্ত বিশ্বাস।[৪৮]

১০। পীর সাহেবকে বা মাজারে সিজদা করা : পীর সাহেব বা মাজারকে উদ্দেশ করে সিজদা বা মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানানো কুফরি কাজ।[৪৯]

১১। পর্দা নিয়ে উপহাস করা : শরিয়তের যেসব বিধান অকাট্যভাবে প্রমাণিত বা ধর্মের সর্বজনবিদিত আবশ্যকীয় বিষয়, পর্দার বিধানও তার অন্তর্ভুক্ত। তা নিয়ে উপহাস করা কুফরি।[৫০]

১২। দাড়ি-টুপি নিয়ে উপহাস : দাড়ি-টুপির উপহাস করা মূলত নবী (সা.)-এর সুন্নত নিয়ে উপহাস।তাই উপহাসকারী ঈমানহারা হয়ে যাবে।[৫১]

১৩। আলেমদের অপমান ও অবজ্ঞা করা : ইলমের কারণে বা দ্বিনের ধারক-বাহক হওয়ায় উলামায়ে কিরামকে হেয়প্রতিপন্ন করা বা কটাক্ষ করা কুফরি। হ্যাঁ, পার্থিব বিষয়ে তাদের কারো কোনো ব্যক্তিগত কর্মের কারণে কটাক্ষ করার দ্বারা কাফের হবে না।[৫২]

১৪। কোরআনের অবমাননা করা : কোরআন শরিফের অবমাননা করা বা পুড়িয়ে ফেলা বা ছিঁড়ে ফেলা স্পষ্ট কুফরি।[৫৩]

১৫। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ছবি ও ব্যঙ্গচিত্র আঁকা : রাসুলে করিম (সা.)-এর অবমাননা যেকোনোভাবেই করা—মুখে হোক কিংবা ছবি এঁকে হোক কুফরি, বিশেষত নবীজি (সা.)-এর ছবি আঁকাও প্রকাশ্য নবীদ্রোহিতা। সুতরাং এ ধরনের রাসুলদ্রোহীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা দায়িত্বশীলদের ওপর ফরজ।[৫৪]

১৬। রাশিচক্র ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব বিশ্বাস করা : ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে রাশিচক্র, গ্রহ-নক্ষত্রের নিজস্ব কোনো প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সুতরাং ভাগ্য ও শুভ-অশুভ গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে হওয়ার আকিদা রাখা শিরক।[৫৫]

১৭। নবী করিম (সা.)-এর পর নবুয়তের দাবি : মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী, তারপর আর কেউ নবী হবে না—এ কথার ওপর ঈমান রাখতেই হবে।

'তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা কুফুরী করেছিল- বলেছিল : 'এতো তোমাদের মত মানুষ ছাড়া কিছুই না, সে তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করতে চায়, আল্লাহ (কাউকে নবীরূপে পাঠানোর) ইচ্ছে করলে তো তিনি ফেরেশতা পাঠাতেন, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের সময়ে এ সব কথা তো শুনিনি।সে কেবল এমন এক লোক, যার মধ্যে পাগলামী রয়েছে। অতএব তোমরা তার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর'।[৫৬]

'কাফিররা বলে- 'এটা মিথ্যে ছাড়া আর কিছুই নয়, সে তা (অর্থাৎ কুরআন) উদ্ভাবণ করেছে এবং ভিন্ন জাতির লোক এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে।' আসলে তারা অন্যায় ও মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে।'[৫৭]

'আর তারা বলে, 'এ রাসূলের কী হল, সে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠানো হল না কেন, যে তাঁর সাথে সতর্ককারী হত'?অথবা তাকে ধনভান্ডার ঢেলে দেয়া হয় না কেন অথবা তার জন্য একটি বাগান হয় না কেন যা থেকে সে খেতে পারে?' যালিমরা বলে, 'তোমরা শুধু এক যাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করছ'।'[৫৮]

''যদি কেউ আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, কিন্তু নবী করিম (সা.)-কে শেষ নবী হিসেবে না মানে সে কাফির।[৫৯]

সমাজে প্রচলিত ১৬ টি কুফরি বাক্য সমূহ

১. আল্লাহর সাথে হিল্লাও লাগে।

২. তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। (ফুল চন্দন হিন্দুদের পুজা করার সামগ্র]

৩. কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে (কেষ্ট হিন্দু দেবির নাম, তাকে পাবার জণ্য কষ্ট করছেন?)

৪. মহভারত কি অশুদ্ধ হয়ে গেল? (মহাভারত একটি উপন্যাস, যা সবসময় অশুদ্ধ)

৫। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। (এটি ইসলামের নামে কটূউক্তি করা)

৬। লক্ষী ছেলে, লক্ষী মেয়ে, লক্ষী স্ত্রী বলা। (হিন্দুদের দেব-দেবির নাম লক্ষী। তাই ইসলামে এটি হারাম)

৭। কোন ঔষধকে জীবন রক্ষকারী বলা। (জন্ম-মৃত্য একমাত্র আল্লাহর হাতে)

৮। দুনিয়াতে কাউকে শাহেনসা বলা। (এর অর্থ রাজাদের রাজাধীকার)

৯। নির্মল চরিত্র বোঝাতে ধোয়া তুলশি পাতা বলা। [হিন্দুদের পুজাতে তুলশি পাতা ব্যবহার করা হয়। তারা তুলশি পাতাকে পবিত্র মনে করে]

১০। ইয়া খাজাবাবা, ইয়া গাউস, ইয়া কুতুব ইত্যাদি বলা। (এটি শির্ক, ইসলামের সবচেয়ে বড় পাপ)

১১। ইয়া আলি, ইয়া রাসুল (সাঃ) বলে ডাকা এবং সাহায্য প্রার্থনা করা (আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া শির্ক)

১২। বিসমিল্লায় গলদ বলা। (এটি সরাসরি কুফরি)

১৩। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জালড়া বলা। (কুফরি বাক্য, সাবধান।)

১৪। মধ্যযুগি বর্বরতা বলা। (মধ্যযুগ ইসলামের স্বর্ণযুগ)

১৫। মন ঠিক থাকলে পর্দা লাগে না। (ইসলাম ধংসকারী মতবাদ)

১৬। নামাজ না পড়লেও ঈমান ঠিক আছে বলা। (ইসলাম থেকে বের করার মূলনীতি)

সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক ও কুফরি

১। তাওহীদ বা রিসালাতের কোনো বিষয় অবিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস না করা। মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে তাঁর বান্দা, দাস ও মানুষ রূপে বিশ্বাস না করা। অথবা তাঁকে আল্লাহর অবতার, আল্লাহ তাঁর সাথে মিশে গিয়েছেন, 'যে আল্লাহ সে-ই রাসূল' ইত্যাদি মনে করা। অথবা তাঁকে আল্লাহর নবী ও রাসূল রূপে না মানা। তাঁকে কোনো বিশেষ যুগ, জাতি বা দেশের নবী মনে করা। তাঁর কোনো কথা বা শিক্ষাকে ভুল বা অচল মনে করা। আল্লাহর নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁর শিক্ষার অতিরিক্ত কোনো শিক্ষা, মত বা পথ আছে, থাকতে পারে বা প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে করা।

২। আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেউ দুনিয়া পরিচালনা করে এধরনের বিশ্বাস রাখা। অন্য কোনো সৃষ্টি, প্রাণী, ফিরিশতা, জীবিত বা মৃত মানুষ, নবী বা ওলী সৃষ্টি, পরিচালনা, অদৃশ্য জ্ঞান, অদৃশ্য সাহায্য, রিযিক দান, জীবন দান, সুস্থতা বা রোগব্যাধি দান, বৃষ্টি দান, বরকত দান, অনাবৃষ্টি প্রদান, অমঙ্গল প্রদান ইত্যাদি কোনো প্রকার কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা রাখেন বা আল্লাহ কাউকে অনুরূপ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন বলে বিশ্বাস করা।

৩। আল্লাহ ছাড়া কোনো নবী, ওলী, জিন বা ফিরিশতা সকল প্রকার অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, গায়েব বা দূরের ডাক শুনতে পারেন, সাড়া দিতে পারেন, সদাসর্বদা সর্বত্র বিরাজমান বা হাজির নাযির বলে বিশ্বাস করা।

৪। রাসূলুল্লাহ (ﷺ), ঈসা (আঃ) বা অন্য কাউকে আল্লাহর যাত (সত্তা) বা সিফাত (বিশেষণ)-এর অংশ, আল্লাহর সত্তা, বিশেষণ বা নূর থেকে সৃষ্ট বা জন্ম-দেওয়া বলে বিশ্বাস করা।

৫। কোনো বস্তু, প্রাণী, কর্ম, বার, তিথি, মাস ইত্যাদিকে অশুভ বা অযাত্রা বা অকল্যাণ বলে মনে করা। সকল প্রকার অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাসই শিরক। আমরা অনেক সময় দিনকে উদ্দেশ্য করে বাজে মন্তব্য করি এটিও এক ধরনের শিরক এর মধ্যে পড়ে।

৬। আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা। আল্লাহ ছাড়া কোনো দৃশ্য বা অদৃশ্য, জীবিত বা মৃত প্রাণী বা বস্তুকে; যেমন মানুষ, জিন, ফিরিশতা, মাযার, কবর, পাথর, গাছ, মূর্তি, ছবি ইত্যাদিকে সাজদা করা, তাদের কাছে অলৌকিক সাহায্য, ত্রাণ, দীর্ঘায়ু, রোগমুক্তি, বিপদমুক্তি, সন্তান ইত্যাদি প্রার্থনা করা, তাদের নামে মানত, কুরবানি বা উৎসর্গ করা শিরক। মূর্তিতে ভক্তিভরে ফুলদান, মূর্তির সামনে নীরবে বা ভক্তিভরে দাঁড়ানো এজাতীয় শিরকী বা শিরকতুল্য কর্ম।

৭। আল্লাহর জন্য কোনো ইবাদত করে সে ইবাদত দ্বারা আল্লাহর সাথে অন্য কারো সম্মান প্রদর্শন বা সন্তুষ্টি কামনাও শিরক। যেমন আল্লাহর জন্য সাজদা করা তবে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে সামনে রেখে সাজদা করা, যেন আল্লাহর সাজদার সাথে সাথে তাকেও সম্মান করা হয়ে যায়। অথবা আল্লাহর জন্য মানত করে কোনো জীবিত বা মৃত ওলী, ফিরিশতা, জিন, কবর, মাযার, পাথর, গাছ ইত্যাদিকে মানতের সাথে সংযুক্ত করা।

৮। আল্লাহ, তাঁর রাসূল বা তাঁর দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয় অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অবজ্ঞা করা বা অপছন্দ করা কুফর। এ জাতীয় প্রচলিত কুফরীর মধ্যে অন্যতম আল্লাহর বিভিন্ন বিধান, যেমন - নামায, পর্দা, বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি, ইসলামী আইন ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ বা এগুলিকে বর্তমানে অচল বা মধ্যযুগীয় মনে করা।

৯। ইসলামকে শুধু ব্যক্তি জীবনে পালন করতে হবে এবং সমাজ, বিচার, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলাম চলবে না বলে মনে করা, ইসলামের কোনো বিধান বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা, ওয়াজ মাহফিল, যিক্র, তিলাওয়াত, নামায, মাদ্রাসা, মসজিদ, বোরকা, পর্দা ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা অনুভব করা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা পূর্ববর্তী অন্য কোনো নবী-রাসূলের প্রতি সামান্যতম অবজ্ঞা প্রকাশ করা।

১০। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করা, তাঁর পরে কারো কাছে কোনো প্রকার ওহী এসেছে বা আসা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা।

১১। সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারকি, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো নিয়ম, পদ্ধতি, রীতি, নীতি, আদর্শ, আইন ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোনো নিয়ম, নীতি, মতবাদ বা আদর্শ বেশী কার্যকর, উপকারী বা উপযোগী বলে মনে করা। যুগের প্রয়োজনে তাঁর শেখানো পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করা। এগুলো সবই কুফর।

১২। যে কোনো প্রকার কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী। উপরে বর্ণিত কোনো কুফুর বা শিরকে লিপ্ত মানুষকে মুসলিম মনে করা বা তাঁদের আকীদার প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী। যেমন যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে সর্বশেষ নবী বলে মানেন না বা তাঁর পরে কোনো নবী থাকতে পারে বা ওহী আসতে পারে বলে বিশ্বাস করেন তাদেরকে কাফির মনে না করা কুফরী। অনুরূপভাবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে সঠিক বা পারলৌকিক মুক্তির মাধ্যম বলে মনে করা, সব ধর্মই ঠিক মনে করা কুফর। অন্যান্য ধর্মের শিরক বা কুফরমূলক অনুষ্ঠানে

অংশগ্রহণ করা, সেগুলোর প্রতি মনের মধ্যে ঘৃণাবোধ না থাকা, অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা, তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অনুকরণ করা, ক্রিসমাস (বড়দিন), পূজা ইত্যাদিতে আনন্দ- উদ্যাপন করা ইত্যাদি বর্তমান যুগে অতি প্রচলিত কুফরী কর্ম ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামই সর্বপ্রথম সকল ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রত্যেকেই তাদের ধর্ম পালন করবেন। তাদের ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা নিষিদ্ধ। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মুক্তি একমাত্র ইসলামের মধ্যে বলে বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ‘সব ধর্মই ঠিক’ বলার অর্থ সকল ধর্মকে মিথ্যা বলা এবং সকল ধর্মকে অবিশ্বাস করা; কারণ প্রত্যেক ধর্মেই অন্য ধর্মকে ‘বেঠিক’ বলা হয়েছে।

১৩। আরেকটি প্রচলিত কুফরী গণক, জ্যোতিষী, হস্তরেখাবিদ, রাশিবিদ, জটা ফকির বা অন্য কোনোভাবে ভাগ্যগণনা, ভবিষ্যৎ গণনা বা গোপন জ্ঞান দাবি করা অথবা এসকল মানুষের কথায় বিশ্বাস করা। এ ধরনের কোনো কোনো কর্ম ইসলামের নামেও করা হয়। যে নামে বা যে পদ্ধতিতেই করা হোক গোপন তথ্য, গায়েব, অদৃশ্য, ভবিষ্যৎ বা ভাগ্য গণনা বা বলা জাতীয় সকল কর্মই কুফরী কর্ম। অনুরূপভাবে কোনো দ্রব্য, পাথর, ধাতু, অষ্টধাতু, গ্রহ বা এ জাতীয় কোনো কিছু মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে অথবা দৈহিক বা মানসিক ভালমন্দ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা শিরক।

হাদিসে এসেছে,

‘হযরত সাফিআ বিনতে আবু উবায়দা [রা] নবি করীম [সা] এর কোন এক স্ত্রীর মাধ্যমে নবি করিম কর্তৃক বর্ণনা করেছেন।তিনি বলেছেন, যে বযক্তি গণক বা হস্তরেখাবিদের কাছে গমন করে কোন বিষয়ে জানতে চায় এবঙ্গ [সে যা বলছে] তা বিশ্বাস করে,চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত মঞ্জুর হবে না।‘[৬০]

১৪। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো কোনো কর্ম, পোষাক, আইন, বিধান, রীতি, সুন্নাত, কর্মপদ্ধতি বা ইবাদত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা বা উপহাস করা।

‘.............. অতঃপর যখনই কোনো রাসুল তোমাদের কাছে এমন কোনো নির্দেশ নিয়ে এসেছে ,যা তোমাদের নফস পছন্দ করে না,তখনই তোমরা অহংকার করেছ।শেষ পর্যন্ত তোমরা এক দলকে মিথ্যাবাদি বলেছ এবং এক দলকে হত্যা করেছ।‘[৬১]

১৫। কোনো মানুষকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শরীয়তের উর্ধ্বে মনে করা বা কোনো কোনো মানুষের জন্য শরীয়তের বিধান পালন করা জরুরী নয় বলে বিশ্বাস করা কুফরী। যেমন, মারিফাত বা মহববত অর্জন হলে, বিশেষ মাকামে পৌঁছালে আর শরীয়ত পালন করা লাগবে না বলে মনে করা। অনুরূপভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল উপার্জন, পর্দা ইত্যাদি শরীয়তের যে সকল বিধান প্রকাশ্যে পালন করা ফরয তা কারো জন্য গোপনে পালন করা চলে বলে বিশ্বাস করাও কুফরী।

‘উবায়দুল্লাহ (রহঃ) এবং মুহাম্মদ ইবনু আবদুল আলা কায়সী (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ জাহল বলেছিল, মুহাম্মাদ কি তার মুখমণ্ডল যমীনের উপর রাখছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ রাখছে। তখন সে বলল, আমি লাত এবং উযযার কসম করে বলছি, আমি যদি তাকে এমন করতে দেখি তবে অবশ্যই আমি তার ঘাড় পদদলিত করবো। অথবা তার মুখমণ্ডল আমি মাটিতে মেখে দিব। (নাউযুবিল্লাহ) অতঃপর একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ে মগ্ন ছিলেন। এমতাবস্থায় আবূ জাহল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘাড়কে পদদলিত করার লক্ষ্যে তার নিকট আসল। হঠাৎ করে লোকেরা দেখতে পেল যে, সে একা একা নিজের দু'হাত দ্বারা কোন কিছুকে প্রতিহত করা অবস্থায় পা পা করে পেছনের দিকে সরে আসছে। এ দেখে তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তোমার কি হায়ছে? উত্তরে সে বলল, আমি দেখেছি যে, আমার এবং তাঁর মাঝে আগুণের একটি প্রকান্ড খাদক, ভয়াবহ অবস্থা এবং কতগুলো ডানা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সে যদি আমার নিকটে আসতো, তবে ফিরিশতাগণ তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে নিয়ে যেতো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, (বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) এর হাদীসের মধ্যে এ কথাটি আছে, না এ মর্মে তার নিকট সংবাদ পৌছেছে, এ বিষয়টি আমার জানা নেই!) “কখনো ঠিক নয়, মানুষ তো সীমালঙ্গন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যার্বতন সুনিশ্চিত। আপনি কি তাকে দেখেদেছেন, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে? আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদি সে সৎপথে থাকে অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়, আপনি লক্ষ্য করেছেন কি, যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে সে কি জানেনা যে, আল্লাহ দেখেন? সাবধান, সে যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব বৈঠকীদের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে, মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠ কেশগুচ্ছ অতএব সে তার নাদিয়া অর্থাৎ তার সম্প্রদায়কে আহবান করুক।”[৬২]

১৬। যাদু, টোনা, বান ইত্যাদি ব্যবহার করা বা শিক্ষা করা।

১৭। ইসলাম ধর্ম জানতে-বুঝতে আগ্রহ না থাকা। ইসলামকে জানা ও শিক্ষা করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না করা বা এ বিষয়ে মনোযোগ না দেয়া। [৬৩]

কুফর ও ইমান এর মধ্যে পার্থক্য

‘মূসা’দ্দাদ (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসমুক্ষে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যাক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন ’ঈমান কি?’ তিনি বললেনঃ ’ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ’ইসলাম কি?’ তিনি বললেনঃ ’ইসলাম হল, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সঙ্গে শরীক করবেন না, সালাত (নামায/নামাজ) কায়েম করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমযানের সাওম (রোযা/রোজা/সিয়াম/ছিয়াম) পালন করবেন। ঐ ব্যাক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ’ইহসান কি?’ তিনি বললেনঃ ’আপনি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাস রাখবেন যে,) তিনি আপনাকে দেখছেন।

ঐ ব্যাক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ’কিয়ামত কবে?’ তিনি বললেনঃ ’এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশি জানেন না। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছিঃ বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামতের বিষয়) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভূক্ত, যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জাননা। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেনঃ (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) “কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহই নিকট।” (৩১ : ৩৪) এরপর ঐ ব্যাক্তি চলে গেলে তিনি বললেনঃ ’তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন।’ তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, ’ইনি জিবরীল আলাইহিস সালাম। লোকদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন। আবূ আব্দুল্লাহ বুখারী (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব বিষয়কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।’[৬৪]

উপরের হাদিস দ্বারা আমরা ইমান সম্পর্কে ধারনা পেলাম। অর্থাৎ ইমান হল আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্টির উপর বিশ্বাস।তবে কুফর হল ঠিক এর বিপরীত । আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাস, তার নেয়ামতের প্রতি,নবি রাসুলগনের প্রতি অবিশ্বাস,যা একজন মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য যথেষ্ট।

ইমানের দ্বারা একজন বান্দা আল্লাহর খুব নিকটবর্তী হতে পারে।ইমান যত মজবুত হবে তিনি ততটাই সফলকাম হবে দুনিয়া ও আখিরাতে।এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাকে আখিরাতে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করবেন , যা তাকে জান্নাতের উঁচু মাকামে পৌছাতে সহায়তা করবে,নবিজি [সা] ও তার সাহাবাগণ এবং সকল নেক বান্দাদের সাথে জান্নাতে মিলিত হবার সুযোগ করে দিবে,শুধু তাই নয় দুনিয়াতেও তিনি হবেন অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানিত এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাতারে সামিল হবার তৌফিক গ্রহন করবেন।

'সুশোভিত করা হয়েছে তাদের জন্য – যারা কুফরি করেছে ,পার্থিব – জীবনকে এবং তারা মুমিনদের সাথে টিপ্পনি কাটে। পক্ষান্তরে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ,তারা কিয়ামুতের দিন তাদের চেয়ে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত রিজিক দান করেন।'[৬৫]

কিন্তু অপর দিকে কুফর তথা কাফের ব্যক্তির জন্য বাহ্যিক ভাবে দেখলে সফল সুখী মনে হলেও সে নিতান্তই একজন লাঞ্চিত ব্যক্তি।তার জন্য দুনিয়াতে যেমন শাস্তির কমতি নেই তেমনি আখিয়ারতে তাকে হতে হবে চরম পর্যায়ের লাঞ্চিত,অবমাননার স্বীকার।তার জন্য জাহান্নাম ই হবে এক মাত্র আশ্রয়স্থল,যেখানকার জ্বালানি হবে স্বয়ং মানুষ ,জীন ও পাথর।সে কোনো দিন এই শাস্তি থেকে মুক্ত পাবে না।

'অবশ্যই যারা পাপ অর্জন করে এবং তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেয় ,তারাই জাহান্নামের অধিবাসী; তারা সেখানে স্থায়ী হবে।'[৬৬]

'অতএব যারা কুফরি করেছে ,তাদেরকে আমি দুনিয়া এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেব, আর তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না'[৬৭]

কুফরের কুফল ও পরিণতি

মানবজীবনে কুফরের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কুফরের ফলে শুধু দুনিয়াতেই নয় বরং আখিরাতেও মানুষকে শোচনীয় পরিণতি বরণ করতে হবে। এর কতিপয় কুফল নিয়ে উল্লেখ করা হল।

ক. অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা

কুফর মানুষের মধ্যে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার জন্ম দেয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের বিভিন্ন নেয়ামতে জীবনকে পরিপূর্ণ করে রেখেছেন।যদি আমরা তার অবাধ্যতায় ,অকৃতজ্ঞতায় জীবনযাপন করি তবে আমরা অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্চনার স্বীকার হব।কেননা মালিকের অবাধ্যতা করলে অবশ্যই তাঁর সাজা পেতে হবে।

খ. পাপাচার বৃদ্ধি

কাফির ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা, পরকাল, হাশর, মিযান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি অবিশ্বাস করে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে মানুষকে তার কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে এরূপ ধারণাও অস্বীকার করে থাকে।তাদের নিকট দুনিয়ার জীবন ই উত্তম বলে বিবেচিত হয়।কেননা আল্লাহ তায়ালা ই তাদের জন্য দুনিয়াকে সু সজ্জিত করে রেখেছেন।আল্লাহ তায়ালা বলেন,
'সুশোভিত করা হয়েছে তাদের জন্য – যারা কুফরি করেছে ,পার্থিব – জীবনকে এবং তারা মুমিনদের সাথে টিপ্পনি কাটে। পক্ষান্তরে যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ,তারা কিয়ামুতের দিন তাদের চেয়ে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত রিজিক দান করেন।'[৬৮]

কিন্তু দুনিয়ার এই চাকচিক্যই তাদের জন্য পরকালে আযাব নিয়ে আসবে।সাথে দুনিয়াতে তারা সুখ শান্তির খোজে হাজারো পাপে জড়িত হতে থাকবে।

গ. হতাশা সৃষ্টি

স্বভাবগতভাবেই মানুষ ভরসা করতে পছন্দ করে। আশা-ভরসা না থাকলে মানুষ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পারে না।মুমিন বান্দার একমাত্র ভরসা স্থল আল্লাহ তায়ালা।তবে যেহেতু কাফির

ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তকদিরে অবিশ্বাস করে। ফলে সে যেকোনো বিপদে আপদে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে। কেননা আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত এই দুনিয়াতে কেউই কারো জন্য ভরসা স্থল নয় এমনকি একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই মুমিনদের জন্য আভিভাবক। তকদিরে বিশ্বাস না থাকায় যেকোন ব্যর্থতায় সে চরম হতাশ হয়ে পড়ে। ফলে তার জীবন চরম হতাশাগ্রস্তভাবে অতিবাহিত হয়।

ঘ. অনৈতিকতার প্রসার

কুফর মানবসমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটায়। আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস না থাকায় কাফির ব্যক্তি নৈতিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না এবং দুনিয়ার স্বার্থে মিথ্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি যেকোনো পাপ ও অনৈতিক কাজই সে বিনা দ্বিধায় করতে পারে। নবি-রাসুলগণকে বিশ্বাস না করায় তাঁদের নৈতিক চরিত্র এবং শিক্ষাও সে অনুসরণ করে না। এভাবে কুফরের মাধ্যমে সমাজে অনৈতিকতার প্রসার ঘটে।

ঙ. আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি

কুফরির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাস, অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। কাফির আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধের কোন পরোয়া করে না। বরং আল্লাহ তায়ালা, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বিদ্রোহ ও বিরোধিতা করে। ফলে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আর যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন, সে যত ক্ষমতা ও সম্পদের মালিক হোক না কেন তার ধ্বংস অনিবার্য।

‘যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন কাফেরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পরবে এবং বলা হবে ‘এটাই তো তোমরা চাইতে।‘[৬৯]

চ. অনন্তকালের শাস্তি

পরকালে কাফিররা জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

“যারা কুফরি করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।”[৭০]

কুফর একটি মারাত্মক পাপ। সুতরাং এ থেকে সকলেরই বেঁচে থাকা উচিত।

‘ নিশ্চয় মুশরিক ও আহলে কিতাবের যারা কুফরি করেছে তাদের স্থান জাহান্নামে।সেখানে তারা চিরস্থায়িভাবে অবস্থান করবে ।তারাই হল সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি জীব।‘[৭১]

এছাড়া দুনিয়াতেও কাফিরদের আযাব রয়েছে,আল্লাহ বলেন,
‘ আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ইমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তার কারনে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।‘[৭২]

যারা কুফরি করে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,
‘আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তর তা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখ, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।‘[৭৩]

হাদিসের আলোকে কুফরি কর্ম বনাম কাফের ব্যক্তি

ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি কুফরী কর্মে লিপ্ত হলে তার কর্মকে কুফর বলতে হবে, তাকে কুফরী পর্যায়ের পাপে লিপ্ত বলতে হবে, তবে তাকে কাফির বলার আগে তার কোনো ওজর আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। কিছু জানতে না পারলে ওজর আছে বলেই ধরে নিতে হবে। এ দ্বারা তার কুফরী কর্মকে অনুমোদন করা হয় না, বরং ভুলক্রমে মুমিনকে কাফির বলার মহাপাপ থেকে আত্মরক্ষা করা হয়। মুমিন সকল প্রকার কুফর-শিরককে ঘৃণা ও নিন্দা করার পাশাপাশি মুমিনকে কাফির বলার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। এ বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্য আমি ''কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা'' এবং ''ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ'' বইয়ে আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(১) আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে মহান আল্লাহর বিধান অনুসারে ফয়সালা না করাকে কুফর বলা হয়েছে। পাশাপাশি আল্লাহর বিধান বিরোধিতায় লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে মুমিন বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে বিভিন্ন কর্মকে কুফর বলা হলেও এরূপ কর্মে লিপ্ত ঈমানের দাবিদারদের মুসলিম বলেই গণ্য করা হয়েছে।

(২) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: ''একব্যক্তি জীবনভর সীমালঙ্ঘন ও পাপে লিপ্ত থাকে। যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে তার পুত্রদেরকে ওসিয়ত করে বলে: আমার মৃত্যু হলে তোমরা আমাকে আগুনে পুড়াবে। এরপর আমাকে বিচুর্ণ করবে। এরপর ঝড়ের মধ্যে আমাকে (আমার দেহের বিচুর্ণিত ছাই) সমূদ্রের মধ্যে ছাড়িয়ে দেবে। কারণ, আল্লাহর কসম, যদি আমার প্রতিপালক আমাকে ধরতে সক্ষম হন তবে আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যে শাস্তি তিনি অন্য কাউকে দেন নি। তার সন্তানগণ তার ওসিয়ত অনুসারে কর্ম করে। তখন আল্লাহ যমিনকে নির্দেশ দেন যে যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত দিতে। তৎক্ষণাৎ লোকটি পুনর্জীবিত হয়ে তার সামনে দন্ডায়মান হয়ে যায়। তখন তিনি লোকটিকে বলেন: তুমি এরূপ করলে কেন? লোকটি বলে: হে আমার প্রতিপালক: আপনার ভয়ে। তখন তিনি তাকে এজন্য ক্ষমা করে দেন।''[৭৪]

আমরা দেখি যে, এ ব্যক্তি একটি কুফরী বিশ্বাস পোষণ করেছে। সে ধারণা করেছে যে, তার দেহ এভাবে পুড়িয়ে ছাই করে সমূদ্রে ছড়িয়ে দিলে আল্লাহ তাকে আর পুনরুজ্জীবিত করতে এবং শাস্তি দিতে পারবেন না। তবে তার এ ধারণা ছিল অজ্ঞতা প্রসূত। এজন্য তার মধ্যে বিদ্যমান নির্ভেজাল আল্লাহ-ভীতির কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। এভাবে আমরা

দেখি যে, একটি বিশ্বাস সুনিশ্চিত কুফরী হলেও উক্ত বিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(৩) মক্কা বিজয়ের পূর্বে হাতিব ইবন আবী বালতা'আ (রা) যুদ্ধের গোপন বিষয় ফাঁস করে মক্কার কাফিরদের নিকট একটি পত্র লিখেন। পত্রটি উদ্ধার করার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাতিব (রা)-কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, মুনাফিকী বা কুফরীর কারণে তিনি এরূপ করেন নি, বরং নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে এরূপ করেছেন। হাতিবের কর্ম বাহ্যত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) সাথে খিয়ানত ও কুফর ছিল। এজন্য উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিককে হত্যা করি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বিষয়ে হাতিবের চ

অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে একটি কর্ম সুনিশ্চিত কুফর হতে পারে। তবে এরূপ কর্মে লিপ্ত মুমিন যদি এর কোনো ওযর বা ব্যাখ্যা দেন তবে তা গ্রহণ করতে হবে।

৪) একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করছিলেন। এমতাবস্থায় যুল খুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে:

''হে মুহাম্মাদ, আল্লাহকে ভয় করুন, আপনি তো বে-ইনসাফি করলেন!''

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তাকওয়া বা ইনসাফের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা সুনিশ্চিত কুফর। এজন্য মাজলিসে উপস্থিত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) লোকটিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: ''না। হয়তবা লোকটি সালাত আদায় করে।'' খালিদ (রা) বলেন: ''কত মুসল্লীই তো আছে যে মুখে যা বলে তার অন্তরে তা নেই।'' তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ''আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয় নি যে, আমি মানুষের অন্তর খুঁজে দেখব বা তাদের পেট ফেড়ে দেখব।'' [৭৫]

এ থেকে আমরা দেখছি যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলিম দাবি করে এবং ইসলামের ব্যাহ্যিক কিছু কর্ম করে তবে তাকে মুসলিম বলে গণ্য করতে হবে এবং লোকটি কুফরী কথা বললে তার কোনো ওযর আছে বলে ধরে নিতে হবে।

(৫) অজ্ঞতার ওযর সম্পর্কে হুযাইফা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

''কাপড়ের নকশি যেমন মলিন হয়ে মুছে যায় তেমনি মলিন ও বিলীন হয়ে যাবে ইসলাম। এমনকি মানুষ জানবে না যে, সালাত কী? সিয়াম কী? হজ্জ কী, যাকাত কী? এক রাতে

কুরআন অপসারিত হবে (বিস্মৃতি কুরআনকে আবৃত করবে) ফলে পৃথিবীতে কুরআনের কোনো আয়াত অবশিষ্ট থাকবে না। অনেক বয়স্ক নারী-পুরুষ রয়ে যাবে যারা বলবে, আমার আমাদের পিতা-পিতামদেরকে ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’’ কালিমাটি বলতে শুনতাম কাজেই আমরা তা বলি।’’ তখন সিলাহ নামক এক শ্রোতা বলেন, ‘‘তারা সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত কিছুই জানে না, কাজেই তাদের জন্য ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ কোনো কাজে লাগবে না।’’ তখন হুযাইফা মুখ ফিরিয়ে নেন। সিলাহ তিনবার কথাটি বলেন এবং তিন বারই হুযাইফা মুখ ফিরিয়ে নেন। তৃতীয় বারে তিনি বলেন: ‘‘হে সিলাহ, এ কালিমাটি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে।’’ তিনি তিনবার একথাটি বললেন।’’[৭৬]

(৬) ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০টি পৃথক সূত্রের হাদীসে খারিজীগণের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারবার বলেছেন যে, তারা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের হয়ে যাবে। সাহাবীগণ এ সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সবাইকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু কখনোই তাঁরা খারিজীদেরকে কাফির বলে গণ্য করেন নি। তাঁরা সাহাবীগণকে কাফির বলেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তাঁদের নিরস্ত্র পরিজনদেরকে হত্যা করেছে, কিন্তু সাহাবীগণ তাদেরকে কাফির বলেন নি। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া তাদের হত্যার অনুমতি দেন নি। তাদের পিছনে সালাত আদায় করেছেন এবং বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রেখেছেন। [৭৭]

(৭) চার ইমাম ও প্রথম যুগগুলোর অন্যান্য ইমাম খারিজী, শীয়া, মুতাযিলী, মুজাসসিমা, মুশাবিবহা, কাদারিয়া ও অন্যান্য বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অনেক কর্মকে ‘‘কুফর’’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এ সকল ফিরকার অনুসারীদের কাফির বলে গণ্য করেন নি। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল বারবার বলেছেন যে, কুরআনকে মাখলূক বা সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করা কুফর। পাশাপাশি তিনি এ কুফরী মতের প্রধান অনুসারী, প্রচারক ও পৃষ্ঠপোষক খলীফা মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিককে মুমিন বলে গণ্য করেছেন, কুফরী আকীদা ও পাপ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের আনুগত্যের জন্য জনগণকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁদের ও তাঁদের অনুসারী ইমামদের পিছনে জুমুআ ও ঈদের সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যান্য ইমামও একই পথ অনুসরণ করেছেন। বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর অনেক বিশ্বাস ও কর্ম কুফর বলে গণ্য হলেও এ সকল ফিরকার অনুসারী ব্যক্তি মুসলিমকে তারা কাফির বলে গণ্য করেন নি। শাইখুল ইসলাম তাকিউদ্দীন ইবন তাইমিয়া বলেন...

“কোনো পাপের কারণে বা আকীদাগত মতভেদীয় কোনো বিষয়ে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার কারণে কোনো মুসলিমকে কাফির বলা বৈধ নয়। .... বিদ্রোহী খারিজীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। খলীফায়ে রাশেদ আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিষয়ে সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী যুগের ইমামগণ সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। এতদসত্ত্বেও আলী (রা), সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী কেউ তাদেরকে কফির বলেন নি, বরং তাদেরকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করেছেন।.... হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও ইজমার মাধ্যমে যাদের বিভ্রান্তি প্রমাণিত তাদের বিষয়েই এরূপ বিধান। অন্যান্য বিভ্রান্ত দল-উপদলের বিভ্রান্তি আরো অনেক অস্পষ্ট। যে সকল বিষয়ে তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে সে সকল বিষয়ে অনেক সময় তাদের চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ আলিমেরও পদস্খলন হয়েছে। .... উপরন্তু মহান আল্লাহ জামাআত বা ঐক্যের ও সম্প্রীতির নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিদআত ও মতভেদ নিষেধ করেছেন।”[৭৮]

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর বিশেষণ অস্বীকার করা ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমাম কুফর বলেছেন। এগুলো মূলত কর্মের বিধান। কিন্তু অনেকে এ বিষয়ে প্রান্তিকতায় নিপতিত হয়েছেন। হাম্বালী-সালাফী ও আশআরী-মাতুরিদীগণ এ প্রসঙ্গে একে অপরকে কাফির বলেছেন। এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘কথার দাবি’ দ্বারা কাফির বলা। কেউ বলেছেন: “মহান আল্লাহর হাত, মুখমণ্ডল, চক্ষু, আরশের উপরে থাকা, অবতরণ ইত্যাদি যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে সে কাফির। কারণ সে মহান আল্লাহকে দেহধারী বলে বিশ্বাস করে।” এরা ‘তুলনাযুক্ত’ ও ‘তুলনামুক্ত’ বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য করছেন না। কেউ বলছেন: “যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর হাত অর্থ ক্ষমতা, আরশে অধিষ্ঠান অর্থ ক্ষমতা গ্রহণ... বলে বা তাঁর ঊর্ধ্বত্ব অস্বীকার করে সে জাহমী-কাফির; কারণ সে কুরআন বা হাদীস অস্বীকার করে।” তারা ইজতিহাদী ব্যাখ্যা ও জেদপূর্বক অস্বীকারের মধ্যে পার্থক্য করছেন না।

যে ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের কোনো বক্তব্য বা বিশেষণ ইজতিহাদী কারণে ব্যাখ্যা করা জরুরী মনে করেন তার প্রসঙ্গে ইবন তাইমিয়া বলেন: তার ইজতিহাদ ভুল হলেও তিনি কাফির নন। মৃতদেহ পোড়ানোর ওসিয়তকারী আল্লাহর ‘কুদরত’ বিশেষণ অবিশ্বাস করেছিল। এরপরও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। এ বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন:

“যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণে সচেষ্ট, তবে ইজতিহাদের কারণে এরূপ তাবীল-ব্যাখ্যা করেন তিনি এ ব্যক্তির চেয়ে ক্ষমা লাভের অধিক যোগ্য।”[৭৯]

ইবন তাইমিয়া আরো বলেন:

“কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির বলা, ফাসিক বলা বা পাপী বলা আমি কঠোরভাবে নিষেধ করি। কেবলমাত্র যদি কারো বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সুনিশ্চিতভাবে কুফর, ফিসক বা পাপাচার প্রমাণিত হয় তবেই তা বলা যাবে। আমি নিশ্চিত যে, মহান আল্লাহ এ উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেছেন। আর ফিকহী মাসআলার ভুল এবং আকীদা বিষয়ক ভুল উভয় প্রকারের ভুলই এ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত।”[৮০]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮ হি) বলেন:

“এমনকি খারিজীগণ, যারা আমাদের রক্তপাত ও ধনসম্পদ বৈধ বলে গণ্য করে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গালি প্রদান করে, মহান আল্লাহর বিশেষণসমূহ অস্বীকার করে এবং আখিরাতে তাঁর দর্শন অস্বীকার করে তাদেরও এগুলির কারণে কাফির বলা হয় না। কারণ তাদের এ সকল মতের কারণ ব্যাখ্যা ও কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণ বুঝতে অস্পষ্টতা বা ভুল বুঝা। এর প্রমাণ যে, মুসলিমদের আভ্যন্তরীণ মামলা-মুকাদ্দামায় তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হয়। তবে কেবল খাত্তাবিয়্যাহ ফিরকাকে কাফির বলা হয়েছে।
[খাত্তাবিয়্যাহ সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামগণ আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়পাত্র, তাঁদের মধ্যে ‘উলূহিয়্যাত’ বা আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের কারণে ইলাহ হওয়ার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর সাথে সুস্পষ্ট শির্ক করার কারণে এদেরকে কাফির বলা হয়েছে। দেখুন: বাগদাদী, আব্দুল কাহির, আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃ. ২৪৭]
আর কোনো ফিরকা যদি দীনের কোনো অত্যাবশ্যকীয় সর্বজনজ্ঞাত বিশ্বাস অস্বীকার করে তবে এরূপ বিদ‘আতের কারণে সে কাফির বলে গণ্য হবে।” [৮১]
আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী বলেন:

“সালাফ সালিহীন- আমাদের ইমাম আবূ হানীফাও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত- থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা কোনো আহলু কিবলাকে কাফির বলি না। এ বক্তব্যের ভিত্তিতেই আকীদাবিদগণ মূলনীতি তৈরি করেছেন যে, শীয়া-রাফিযী, খারিজী, মুতাযিলী, মুজাস্সিমা (দেহে বিশ্বাসী) ও অন্যান্য বিভ্রান্ত ফিরকাকে কাফির বলা যাবে না। তবে কারো আকীদা বিশ্বাস যদি কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে ভিন্ন কথা।” [৮২]

মোল্লা আলী কারী আল্লামা ইবন হাজার মাক্কীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন:

‘‘সালাফ সালিহীন এবং পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলিমের নিকট সঠিক মত এই যে, বিদআতপন্থী এবং বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর অনুসারীদেরকে আমরা কাফির বলব না। তবে যদি তারা সুস্পষ্ট কোনো কুফরী কর্ম বা মত গ্রহণ করে তবে তাদেরকে কাফির বলা হবে। কারো আকীদার দাবি বা পরিণতির অজুহাতে তাকে কাফির বলা যাবে না। কারণ সঠিক মত এই যে, কারো মতের দাবি বা পরিণতি তার মত বলে গণ্য নয়। আর এজন্যই সকল যুগেই আলিমগণ বিভ্রান্ত ফিরকার অনুসারীদের সাথে মুসলিম হিসেবেই আচরণ করেছেন, যেমন তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক, তাদের মৃতদের জানাযার সালাত আদায়, মুসলিমদের গোরস্থানে দাফন করা ইত্যাদি। এ সকল সম্প্রদায় ভুলের মধ্যে নিপতিত এবং তাদের এ ভুলের পক্ষে তাদের কোনো ওযর বা গ্রহণযোগ্য কারণ নেই। এজন্য তাদেরকে পাপী ও পথভ্রষ্ট বলতে হবে। তবে তাদের উদ্দেশ্য কুফরী করা নয়। তারা সত্য সন্ধানে ইজতিহাদ বা চেষ্টা করেছে তবে সত্যে পৌঁছাতে পারে নি। আকল বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির উপর ও নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করা এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ছাড়া সুস্পষ্ট সুন্নাত এবং কুরআনের আয়াতগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণেই তারা সত্যে না পৌঁছে বিভ্রান্ত হয়েছে। আর এখানেই ফিকহী বিষয়ে ইজতিহাদকারীর সাথে তাদের পার্থক্য। ফিকহী বিষয়ে ইজতিহাদকারী ভিন্নমতের একটি দলীলের বিপরীতে একই পর্যায়ের অন্য দলীল থাকার কারণে ভিন্নমত পোষণ করেন। এজন্য তিনি ইজতিহাদের জন্য সাওয়াব লাভ করেন।’’[৮৩]

ইমাম আবূ হানীফা এ পরিচ্ছেদে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এ মূলনীতি অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও তিনি এ বিষয়টি বারবার আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা দেখেছি যে, ইমাম আযম তাঁর ‘‘আল-ফিকহুল আবসাত’’ গ্রন্থে ‘‘আল-ফিকহুল আকবার’’ বা শ্রেষ্ঠতম ফিকহের সংজ্ঞায় বলেছেন: ‘‘পাপের কারণে কোনো কিবলাপন্থী মুসলিমকে কাফির বলবে না এবং কারো ঈমান অস্বীকার করবে না।’’ এ পুস্তকে তাঁর আরেকটি বক্তব্য দেখুন:

‘‘আবূ মুতী বলেন: যদি কেউ বলে, যে পাপে লিপ্ত হয় সে-ই কাফির, তবে তার বক্তব্য

কিরূপে খন্ডন করা হবে তা বলুন। তিনি (ইমাম আবূ হানীফা) বলেন: তাকে বলা হবে: আল্লাহ তাআলা বলেছেন: ‘‘এবং স্মরণ কর যুন্নুন-ইউনূস-এর কথা যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করব না; অতঃপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র মহান, নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিম।’’ [৮৪]

তাহলে তিনি যালিম মুমিন, কাফিরও নন, মুনাফিকও নন। ইউসূফের ভাইগণ বলেছিলেন[14]: ‘‘হে আমাদের পিতা, আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয় আমরা ছিলাম অপরাধী’’; তাঁরা ছিলেন পাপী, কিন্তু তাঁরা কাফির ছিলেন না।[৮৫]

আর মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বলেছেন: ‘‘যেন আল্লাহ মার্জনা করেন ‘তোমার ত্রুটি’ অতীত ও ভবিষ্যতের’’,
[৮৬]

তিনি বলেন নি: ‘‘তোমার কুফর’’। আর মূসা (আঃ) যখন সে মানুষটিকে হত্যা করলেন তিনি হত্যার কারণে অপরাধী হন, কাফির হন নি।’’[৮৭]

আল-ফিকহুল আবসাত গ্রন্থে আবূ মুতী ও ইমাম আযমের আরেকটি কথোপকথন: ‘‘আমি (আবু মুতী) তাঁকে বললাম: হুকুম-পন্থী খারিজীগণ (যারা বলেন যে, আল্লাহ ছাড়া কাউকে হুকুম-বিধান-এর ক্ষমতা প্রদান বা কারো হুকুম-বিধান পালন করা কুফর)-এর বিষয়ে আপনি কী বলেন? তিনি (ইমাম আবূ হানীফা) বলেন: এরা হলো খারিজীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দল। আমি বললাম: আপনি কি তাদেরকে কাফির বলেন? তিনি বলেন: না, তবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যেভাবে নেককার ইমাম-রাষ্ট্রপ্রধানগণ, আলী (রা) এবং উমার ইবন আব্দুল আযীয (রাহ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। .... কারণ খারিজীগণ তাকবীর বলে, সালাত আদায় করে, কুরআন তিলাওয়াত করে.... অতএব খারিজীদের কুফর হচ্ছে নিয়ামতের কুফর বা অকৃতজ্ঞতা, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের অস্বীকার ও অকৃতজ্ঞতা।’’[৮৮]

ইমাম আবূ হানীফা রচিত অন্য পুস্তিকা ‘‘আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম’’-এ এক স্থানে ইমাম আযমের সাথে আবূ মুকাতিলের আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর নিম্নরূপ: ‘‘আবূ মুকাতিল বলেন: যে ব্যক্তি আপনাকে কাফির বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তার বিষয়ে আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন? উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা বলেন: ‘‘তার বিষয়ে আমার সাক্ষ্য যে, সে মিথ্যাবাদী। এজন্য আমি তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করি না, বরং তাকে মিথ্যাবাদী বলি। কারণ মর্যাদা বা হক্ক দু প্রকার। এক হলো আল্লাহর হক্ক বা মর্যাদা নষ্ট করা, অন্যটি হলো আল্লাহর বান্দাদের হক্ক বা মর্যাদা নষ্ট করা। আল্লাহর বান্দাগণের মর্যাদা বা হক্ক নষ্ট করা হলো তাদের মধ্যকার জুলুম ও অন্যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ বিষয়ে যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তার অবস্থা আর আমার বিষয়ে যে মিথ্যা বলে তার অবস্থা এক হতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ নামে মিথ্যা বলছে তার পাপ দুনিয়ার সকল মানুষের নামে মিথ্যা বলার চেয়েও ভয়ঙ্করতর। অতএব যে ব্যক্তি আমাকে কাফির বলে সাক্ষ্য দেয় সে ব্যক্তি আমার মতে মিথ্যাবাদী। তবে সে আমার বিষয়ে মিথ্যা বলেছে এ অজুহাতে তার বিষয়ে মিথ্যা বলা আমার জন্য বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ বলেছেন: ‘‘কোনো গোষ্ঠীর সাথে শত্রুতা যেন তোমাদেরকে বে-ইনসাফী করার প্ররোচনা না দেয়; তোমরা ইনসাফ করবে; ইনসাফ তাকওয়ার সাথে সুসমঞ্জস’’...।’’[৮৯][৯০]

এখানে ইমাম আযম আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কর্মধারা ব্যাখ্যা করেছেন, তা হলো প্রতিপক্ষ বা ভিন্নমতাবলম্বী মুমিনের বাহ্যত কুফরী কথা ব্যাখ্যা করে তাকে মুমিন বলে গণ্য করার চেষ্টা। আমরা দেখেছি যে, বিভ্রান্ত দলগুলো ভিন্নমতের মুমিনদেরকে কাফির বলতে উদগ্রীব থাকে। কোনো সুস্পষ্ট অজুহাত না পেলে তার কোনো একটি বক্তব্য ব্যাখ্যা করে তার ভিত্তিতে তাকে কাফির বলে। পক্ষান্তরে সাহাবীগণ ও আহলুস সুন্নাতের ইমামগণ ভিন্নমতের মুমিনকে মুমিন বলতে উদগ্রীব। তার কথার মধ্যে সুস্পষ্ট কুফরী থাকলেও তা ব্যাখ্যা করে তাকে মুমিন বলতে চেষ্টা করেন তারা। বিষয়টি ইমাম আবূ হানীফা এখানে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমরা দেখেছি যে, খারিজী ও অন্যান্য বিভ্রান্ত দল সুন্নাত অনুসারীদের কাফির বলত। ইমাম আবূ হানীফাকেও তারা কাফির বলেছে। প্রায় মুতাওয়াতির হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুমিনকে কাফির বলা কুফরী। এ সকল হাদীসের দলীল দিয়ে ইমাম আযম বলতে পারতেন যে আমাকে কাফির বলে সে কাফির। কারণ (১) অনেকগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, মুমিনকে কাফির বলা কুফরী, (২) আমি নিশ্চিতভাবেই মুমিন, (৩) কাজেই যে আমাকে কাফির বলেছে সে নিশ্চিতভাবেই কাফির। কিন্তু আহলুস সুন্নাত-এর ইমামগণ প্রতিপক্ষকে কাফির বানাতে উদগ্রীব ছিলেন না, বরং প্রতিপক্ষকে মুমিন বলে দাবি করতে উদগ্রীব ছিলেন।

এজন্য অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে ইমাম আযম তাকে মিথ্যাবাদী মুমিন বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

"আল-ফিকহুল আবসাত" গ্রন্থের আরেকটি বক্তব্য দেখুন:

"আমি (আবূ মুতী বালখী) বললাম: যদি কেউ আল্লাহর কোনো সৃষ্টি অস্বীকার করে বলে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছেন তা আমি জানি না, তাহলে তার বিধান কী? তিনি (আবূ হানীফা) বলেন: এ তো কুফরী করল; কারণ আল্লাহ বলেছেন: "তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকারী";[৯১]

আর উপরের কথা দ্বারা সে যেন বলল, এ দ্রব্যটির আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে। অনুরূপভাবে যদি সে বলে, আল্লাহ আমার উপর সালাত, সিয়াম ও যাকাত ফরয করেছেন বলে আমি জানি না (অর্থাৎ এগুলির আবশ্যকতা সে অস্বীকার করে) তবে সে কাফির হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন: "সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর"[৯২]

, এবং বলেছেন: "তোমাদের উপর সিয়াম বিধিবদ্ধ হলো"[৯৩]

আল্লাহ আরো বলেছেন: "অতএব আল্লাহর তাসবীহ যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন তোমরা প্রভাতে উপনীত হও। এবং তাঁরই জন্য প্রশংসা আসমানসমূহ এবং যমীনে অপরাহ্নে এবং যখন তোমরা যুহরের সময়ে উপনীত হও।"[৯৪]

এ আয়াতে আল্লাহ সময়ের উল্লেখ করে সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন, কাজেই তা অস্বীকার করলে কাফির হবে।) যদি সে বলে আমি এ আয়াত বিশ্বাস করি, তবে এর ব্যাখ্যা জানি না, তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে না। কারণ সে কুরআনকে বিশ্বাস ও স্বীকার করেছে, কিন্তু ব্যাখ্যায় ভুল করেছে।"[৯৫]

এ পুস্তকে আরো অনেক বিষয় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, যার মূল কথা একটিই: ঈমানের দাবিদারকে যথাসম্ভব ব্যাখ্যা ও ওজর-অজুহাতের মাধ্যমে মুমিন বলে গণ্য করার চেষ্টা করা। যদি কেউ কুরআনের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত কোনে বিষয় অস্বীকার করার ঘোষণা দেয় তবে সে কাফির। আর যদি সে ব্যাখ্যায় ভুল করে, বা কোনো বিশেষ ব্যাখ্যা অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেন ; "কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, কোনো মুসলিমকে কোনো পাপের কারণে কাফির বলে

সাক্ষ্য দিবে, সে পাপ যতই বড় হোক না কেন। এটিই আবূ হানীফার মত এবং আমাদের ফকীহগণের সকলের মত।''[৯৬][৯৭]

মানবজীবনে গুনাহের প্রভাব

গুনাহের পরকালীন শাস্তির কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমরা অনেকেই গুনাহের ইহকালীন কুপ্রভাব সম্পর্কে জানি না। আসলে আমাদের ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গুনাহের অনেক কুপ্রভাব রয়েছে। গুনাহ আমাদের জীবনযাপনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। কখনো কখনো ব্যক্তির করা গুনাহের প্রভাব ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, আবার কখনো সেই প্রভাব ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে এমনকি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।যার দরূন দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন আসমানি আযাব আল্লাহ তায়াল ব্যক্তির কৃত কর্মের জন্য এই দুনিয়াতে প্রদান করেন।

আমরা নিয়মিত গুনাহ করে যাচ্ছি। অথচ এসব গুনাহ আমাদের জীবনে কিভাবে কুপ্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে তা আমরা অনেকেই বুঝি না, বোঝার চেষ্টাও করি না। খারাপ থেকে বাঁচার জন্যই খারাপকে চিনতে হবে।

কবি আবূ ফারাস আল হামদানী বলেছেন :

''আমি খারাপকে চিনেছি, খারাপ কিছু করার জন্য নয় বরং খারাবী থেকে বাঁচার জন্য; আর যে মানুষ খারাপকে চিনবে না সে তাতে পতিত হবে।'[৯৮]

কিন্তু কুরআন, হাদীস এবং সালাফে সালিহীনের বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে জানা যায়, এই গুনাহগুলো আমাদের জীবনে কী ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করছে। গুনাহ থেকে বাঁচার অনুভূতি মনের মধ্যে তৈরি করার জন্য গুনাহের কুপ্রভাব জানা জরুরি। তাই গুনাহ মাফের উপায় বর্ণনা করার আগে আমাদের জীবনে গুনাহের কিছু প্রভাব আলোচনা করা জরুরি মনে করছি। নিম্নে কিছু কুপ্রভাব উল্লেখ করা হলো :

১. জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি কমে যাওয়া :

জ্ঞান ও মুখস্থ শক্তি আল্লাহর দেয়া অনন্য নি'আমত। গুনাহের কারণে আল্লাহ এই নি'আমত তুলে নেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) একদিন মাদীনায় ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর

সামনে বসা ছিলেন। তখন ইমাম মালিক ইমাম শাফি‘ঈকে দেখে বুঝলেন যে, ছেলেটির মধ্যে প্রতিভা আছে। তাই তিনি তাকে নসীহত হিসেবে বলেন,

“আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তোমার অন্তরে আলো (জ্ঞান) দান করেছেন, অতএব তুমি এই আলোকে গুনাহের অন্ধকার দিয়ে নিভিয়ে দিও না।”

ইমাম শাফি‘ঈ (রহিমাহুল্লাহ) নিজেই বলেন :

“আমি আমার শিক্ষক ওয়াকি‘-এর নিকট দুর্বল মুখস্থশক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করলাম (অর্থাৎ আমি বললাম যে, আমার মুখস্থশক্তি/স্মৃতিশক্তি দুর্বল। এখন আমি কী করতে পারি?) জবাবে তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করি। তিনি আরও বললেন, জেনে রাখো, জ্ঞান হচ্ছে আলো। আর আল্লাহর আলো তিনি কোন গুনাহগারকে দেন না।”[৯৯]

অনেকে বিভ্রান্ত হন যখন দেখেন, কোন গুনাহগারকেও আল্লাহ তা‘আলা জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি দান করেন। এটা কেন? এর উত্তর জানতে নিচের আয়াত দু’টি পড়ুন :

“আর তুমি তাদের নিকট সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ কর, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তান তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মতো। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহবা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহবা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে কওমের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব তুমি কাহিনীসমূহ বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা করে।”[১০০]

ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম আল জাউযিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ যাকে জ্ঞান দান করেন তাকেই উচ্চমর্যাদা দান করেন না। যথাযথ জ্ঞানের মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা লাভ শুধু জ্ঞানার্জনের চেয়ে অনেক উত্তম ব্যাপার।”

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেলো যে, আল্লাহ কোন গুনাহগারকে জ্ঞানের আলো দেন না। বাহ্যিকভাবে কাউকে দিয়েছেন বলে দেখা গেলে বুঝে নিতে হবে যে, এটি তার জন্য পরীক্ষা। ক্বিয়ামাতের বিচারের মাঠে তার এই জ্ঞান তার বিরুদ্ধেই প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হবে। তাই জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং অর্জিত জ্ঞান ধরে রাখার জন্য গুনাহের কাজ বর্জনের ও জ্ঞানানুযায়ী 'আমলের কোন বিকল্প নেই। সকল মানুষের বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে বেশি সচেতন হওয়া জরুরি।

আলী ইবন হুজর (রহঃ) ..... ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দীনের প্রজ্ঞা দান করেন।'[১০১]

২. রিযক্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া :

গুনাহের কুপ্রভাবগুলো মধ্যে অন্যতম হলো, গুনাহ করলে তা গুনাহকারীর জীবিকা কমিয়ে দেয় বা সে বরকতপূর্ণ জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা অনেকেই একসময় ভালো ও পর্যাপ্ত খাবার এবং অন্যান্য নি'আমত ভোগ করলেও হঠাৎ দেখি রিযক্ব ও নি'আমত কমে যাওয়া শুরু করেছে। তখন আমরা হতাশ হই, এর কারণ খুঁজি। আসল কারণের কথা হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। সাওবান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

''দু'আ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে ফেরায় (পরিবর্তন করে) না, পুণ্য ব্যতীত আর কিছু আয়ুকে বাড়ায় না এবং কৃত পাপের কারণেই বান্দা জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়।''[১০২]

৩. আল্লাহর আনুগত্য কঠিন মনে হওয়া :

গুনাহের কাজের অন্যতম কুপ্রভাব হলো আল্লাহর আদেশ-নিষেধ না মানা এবং নিজের মনের ইচ্ছার লাগামহীন অনুসরণ করা। মানুষ যখন গুনাহ কে গুনাহ ই মনে করে না তখন সেটা ভয়ানক রূপ নেয় ,যা বাহ্যিক ভাবে কখনো প্রকাশ পায় কখনো বা অভ্যন্তরীণ ভাবে। মানুষ যখন গুনাহ করতে থাকে এবং গুনাহের পরিমাণ বাড়াতে থাকে তখন ধীরে ধীরে তার 'ইবাদাতের পরিমাণ কমতে থাকে, ঈমান সঙ্কুচিত হতে থাকে, 'ইবাদাতের প্রতি মনোযোগে ঘাটতি দেখা দেয়, আল্লাহর আনুগত্য করতে না পারলে দুঃখ বা আফসোস লাগে না। গুনাহের প্রভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করা কঠিন মনে হতে থাকে। অন্যায়-অশ্লীলতার চর্চায় সুখ লাভ করে এবং তা অভ্যাসে পরিণত হয়।তখন তার জন্য আল্লাহর ইবাদত এর তুলনায় শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা সহজ হয়ে যায়, যদিও সে তাতে সাময়িকের জন্য আনন্দ অনুভব

করলেও তা তাকে ভিতর থেকে ধীরে ধীরে অশান্তির ,অসস্তির দ্বারা নিঃস্বেস করে দেয়।আল্লাহর আনুগত্য ও শয়তানের আনুগত্য একই সাথে সমান গতিতে চলতে পারে না। তাই শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে গুনাহ অর্জন করতে থাকলে আল্লাহর আনুগত্য করতে মন আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যারা আল্লাহর আনুগত্যে অনীহাবোধ করে, অলসতাবোধ করে অথচ তারা একসময় 'ইবাদাতে মনোযোগী ছিল এবং অন্যকেও দা'ওয়াত দিত তখন বুঝে নিতে হবে যে, তার উপরে তার কৃত গুনাহের কুপ্রভাব পড়েছে। তাই সে ইবাদাতে গাফিল ও পিছিয়ে। তাইতো যারা কাফির তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মৃত বলেছেন; তারা জীবিত নয়।[১০৩] অর্থাৎ কাফিররা শারীরিকভাবে জীবিত থাকলেও আত্মিক ও মানসিকভাবে তারা মৃত।

৪. অন্তর মরে যাওয়া ও অপমানিত হওয়া :

গুনাহ মানুষের অন্তরকে কঠিন করে দেয়, যার দ্বরুন একজন মানুষ তার সেই অন্তর দ্বারা ভাল – খারাপ,সত্য- মিথ্যা এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না।আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। এর কারণে অন্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হয়। গুনাহে লিপ্ত থাকা অসম্মানেরও কারণ।যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে সম্মানিত মনে হলেও সে আসলে নেককার বান্দাদের কাছে নয়।এখানে সম্মানিত তাদের কাছেই যারা তার বা তাদের মত গুনাহে লিপ্ত,এই সম্মান সমসাময়িকের জন্য।সত্যিকারের সম্মান অর্জন একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে ।যে আল্লাহ আনুগত্য যতটুকু করবে সে ততটাই দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানের পাত্র হবে।

সম্মান দেয়ার মালিক আল্লাহ। আল্লাহর অবাধ্যতা করে সম্মানিত হওয়া যায় না। বরং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়া যায়। ফলে সে সকলের আন্তরিক ভালোবাসায় সিক্ত হয়।

কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ ত্যালা বলেন,

'তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বুঝে? তারা কেবল পশুদের মতো; বরং তারা আরো অধিক পথভ্রষ্ট।'[১০৪]

আল্লাহর ভালোবাসা পেলে যেমন মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান পাওয়া যায় তেমনি আল্লাহর অবাধ্যতা করলে তার বিরাগভাজন হতে হয় এবং অপমানিত হতে হয়।

ইমাম 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

"আমি দেখেছি গুনাহ অন্তরকে মেরে ফেলে আর সর্বদা গুনাহে লিপ্ত থাকা অপমান নিয়ে আসে। গুনাহ পরিত্যাগ করা অন্তরের বাঁচিয়ে রাখে আর নফস্ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার মধ্যেই কল্যাণ নিহীত।"

৫. পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়া :

মানুষের গুনাহের কারণে দুনিয়াতে বিভিন্ন রকমের বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিপর্যয় হতে পারে স্থলভাগে, হতে পারে জলভাগে (সাগর-নদীতে), হতে পারে আকাশে, হতে পারে ফল-ফসলে, হতে পারে বাসস্থানে। এই বিপর্যয়ের কথাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।"[১০৫]

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, "হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোন জাতি ওযন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাশীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন।"[১০৬]

৬. সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা ও মনস্তাত্বিক রোগে ভোগা :

গুনাহগার ব্যক্তি সবসময় জানা-অজানা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। কেননা গুনাহ একজন মানুষ কে তার রব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে ।যার দ্বরুন সে হয়ে পড়ে অসহায় । যখন কেউ গুনাহ করে তখন সে আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যায়।এর ফলে সে মানুসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পরে,মানুসিকভাবে তাকে তার গুনাহ তাড়া করতে থাকে।যার কারনে সে হয়ে পড়ে একজন মানুষিক ভাবে অসুস্থ একজন রোগী।

‘কাফেররা সর্বদাই সন্দেহের মধ্যে থাকবে,যতক্ষণ না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে পরবে ;অথবা এসে পরবে তাদের কাছে বন্ধ্যা দিনের শাস্তি।‘[১০৭]

আর আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে এমন এক নিরাপত্তা যার ভিতরে কেউ ঢুকলে সে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে।

আর যে আল্লাহর আনুগত্যের নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যাবে সে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। সে মনে মনে ভাববে, কখন না জানি মৃত্যু চলে আসে, কখন না জানি শাস্তি চলে আসে। সে মৃত্যুকে ভয় পাবে। কারণ সে জানে যে, মারা গেলে পরেই তার প্রাপ্য শাস্তি শুরু হয়ে যাবে।কারন দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি ই সব অস্বীকার করতে পারলেও মৃত্যুকে অস্বীকার করতে পারে না।হোক সে হিন্দু ,খ্রিস্টান যেকোন অমুসলিম। মৃত্যুর ভয় প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর মৃত্যুকে ভয় পাবার কারণে সে ঝুঁকিপূর্ণ যে কোন কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। এভাবে সারাক্ষণ সে ভয়ের মধ্যে কাটাবে, হীনমন্যতায় ভুগবে। একটা পর্যায়ে তাকে ‘‘ভয়রোগ’’ গ্রাস করে ফেলবে, যা আজকাল পৃথিবীর সবচেয়ে মহামারী রোগ হিসেবে চিহ্নিত। ফলে সে কোন সৃজনশীল কাজ করতে পারবে না।

৭. মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হওয়া :

গুনাহের প্রভাবে মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হয়। কাফিররা আর মুসলিমদেরকে ভয় পায় না। বর্তমানেও এমন অবস্থাই সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এই মুসলিমরাই ইসলামের প্রথম যুগে অস্ত্রশক্তিতে দুর্বল হওয়ার পরও শুধু ঈমানের ও ‘আমলের বলে বলিয়ান হয়ে কাফিরদের পরাজিত করেছিল। কিন্তু আজ মুসলিমরা গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে নিজেদের ঈমান ও ‘আমলের শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে।

যে মুসলিমরা শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলেও মৃত্যু পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে গিয়েছে সেই মুসলিমরাই আজ পায়ে একটি কাঁটা বিধঁলে ভয়ে ঘর থেকে বের হয় না।

মুসলিমরা আজ ইতিহাসের যে কোন সময়ের তুলনায় সংখ্যায় বেশি হলেও তাদেরকে আজ কাফির-মুশরিকরা পাত্তা দিচ্ছে না। এর কারণ কী? এর অন্যতম কারণ হচ্ছে মৃত্যুভয়। আর মৃত্যুভয় তৈরি হয় গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকলে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন :

"অদূর ভবিষ্যতে অন্য জাতির লোকেরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে, যেমন খাদ্য গ্রহণকারী বড় পাত্রের দিকে আসে। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আমাদের সংখ্যা কি তখন কম হবে? তিনি বলেন, না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের ভীরুতা দূর করে দেবেন। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! 'আল ওয়াহ্ন' কী? তিনি (সা.) বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।[১০৮]

৮. লজ্জা-শরম কমে যাওয়া :

গুনাহের কাজ ধীরে ধীরে হায়া তথা লজ্জা মানুষের স্বভাব থেকে বিদায় নেয়। তখন সে যা ইচ্ছা তা-ই বলতে পারে, করতে পারে। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

"যখন তোমার থেকে লজ্জা চলে যাবে তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করো।"[১০৯]

অর্থাৎ লজ্জাহীন মানুষ যা ইচছা তা-ই করতে পারে। আর লজ্জার পুরোটুকুই কল্যাণ। যার লজ্জা নাই তার কাছে কল্যাণও থাকার কথা না।আর একজন মেয়ের মাঝে যদি হায়া বলতে কিছু না থাকে তবে সে মেয়ের সাথে একজন পুরুষের তুলনার কিছু থাকে না।এখনকার সময়ে মেয়েদের অবস্থা ছেলেদের থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সাহাবী হযরত উসমান [রা] সম্পর্কে আমাদের সকলেরই কম বেশি জানা আছে।তবে তার হায়া তাকে এই উম্মতের মাঝে স্মরনীয় হয়ে থাকার জন্য উত্তম একটি গুণ। বলা যেতে পারে এখনকার সময়ের মেয়েদের তুলনায় প্রিয় সাহাবি উসমান [রা] এর লজ্জার কোন তুলনা হয় না।

লজ্জাহীন মানুষ কল্যাণহীন হতে পারে। আর যখন কারো মধ্যে কল্যাণ থাকবে না তখন তার কর্মকা- বিপথে পরিচালিত হবে। এগুলো সবই তার গুনাহের কুপ্রভাবে হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যত্র বলেছেন :

“লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।”[১১০]

৯. আল্লাহর নি‘আমত থেকে বঞ্চিত হওয়া :

গুনাহের কারণে ব্যক্তি আল্লাহর অনেক নি‘আমত থেকে বঞ্চিত হয়। ‘আলী বলেন,

“যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে থাকো তাহলে তার যত্ন নাও। কারণ গুনাহ নি‘আমতকে দূর করে দেয়।”

দুনিয়ার জীবনে তাকে কোন না কোন সময় লাঞ্চনা অবজ্ঞার স্বীকার হতে হবে।

১০. গুনাহের কারণে গুনাহগার ও তার রবের মাঝে এবং তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে দূরত্ব ও দুঃসম্পর্ক তৈরি হয় :

কোন এক পূর্ববর্তী বিদ্বান বলেছেন,

“আমি যখন আল্লাহর অবাধ্য হই তখন তার কুপ্রভাব আমি আমার বাহন ও আমার স্ত্রীর আচার-আচরণে দেখতে পাই।”

১১. দৈনন্দিন কাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও সমস্যায় পড়া :

গুনাহের কুপ্রভাবে গুনাহগার যখনই কোনো কাজ করতে যায় তখনই সে তাতে বাধাপ্রাপ্ত ও সমস্যায় পতিত হয়। তার উপরে কাজটি কঠিন হয়ে যায়। এর বিপরীতে মুত্তাকী ব্যক্তি যখন কোনো কাজ করতে যায় তখন আল্লাহ তার জন্য সে কাজকে সহজ করে দেন। তবে তাকে আল্লাহ কখনো কখনো পরীক্ষাও করেন।

সে যতই আত্মবিশ্বাসী থাকুক না কেন তার কাজ বা প্রতিভা নিয়ে,সে কিছুতেই তার সফলতা অর্জন করতে পারে না।যদিও সে তা অর্জন করুক না কেন তাতে সে বেশিদিন স্থায়ী থাকতে পারে না।

১২. গুনাহ গুনাহগারের জীবনকে অন্ধকারময় করে দেয় :

গুনাহগার ব্যক্তি তার অন্তরে অন্ধকার অনুভব করে।তার চারপাশে হাজারো মানুষ ,আলো সজ্জিত থাকা সত্ত্বেও সে একাকি অনুভব করে ,যা তাকে তিলে তিলে ভিতর থেকে শেষ

করে দিতে সক্ষম। রাতের অন্ধকারে আলোহীন পথিকের যে অবস্থা হয় গুনাহের ভারে নিমজ্জিত ব্যক্তিরও তেমন অবস্থা হয়।

চোখ না থাকার কারণে যেমন অন্ধ ব্যক্তির সামনে দুনিয়ার সবকিছু অন্ধকার মনে হয় তেমনি গুনাহের কারণে চামড়ার চোখ থাকার পরও গুনাহের অন্ধকারে গুনাহগারও হাবুডুবু খায়। কারণ আল্লাহর আনুগত্য করাই হচ্ছে আসল আলো। আর তাঁর অবাধ্যতাই হচ্ছে অন্ধকার।

অন্ধকার যত বাড়তে থাকে আলোহীন পথিক যেমন বেশি পথ হারায় তেমনি গুনাহগারও যখন গুনাহ মাফ না করিয়ে নতুন নতুন গুনাহ করতে থাকে তখন ধীরে ধীরে সে বিদ্‘আত, বিভ্রান্তি ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ সে বুঝতেই পারে না যে সে বিপথে চলছে। একসময় সে কোন কিছুকেই গুনাহ মনে করে না। সবকিছুকেই বৈধ ও সঠিক কাজ মনে করে।

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আববাস বলেন,

“সাওয়াবের কাজ হলো চেহারা উজ্জ্বলতা, অন্তরের আলো, রিযক্বের প্রশস্তি, শরীরের শক্তি এবং মানুষের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টিকারী। আর গুনাহ হচ্ছে চেহারার কলুষতা, অন্তরের অন্ধকার, শরীরের দুর্বলতা, রিযক্বের সংকট ও মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী।”

১৩. গুনাহের কারণে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হতে হয় :

আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া গুনাহের আর যদি কোনো কুপ্রভাব না থাকতো তাহলে শাস্তি হিসেবে এটাই যথেষ্ট হতো। আমরা যদি একবার চিন্তা করে দেখি যে, গুনাহের শাস্তি হিসেবে আমরা আর আল্লাহর আনুগত্য করতে পারবো না- এমন যদি হতো তাহলে তা কতই না ভয়াবহ একটি ব্যাপার হতো। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, আ-মীন।)

গুনাহের কারণে আল্লাহর আনুগত্যের পথ ও সুযোগ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একটি, দু’টি, তিনটি করতে করতে আনুগত্যের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এসব আনুগত্যের পথগুলোর এক একটি দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম ছিল।

১৪. গুনাহ চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় :

গুনাহ ধীরে ধীরে গুনাহগারের অন্তরে গুনাহ থেকে বাঁচার ইচ্ছাকে দুর্বল করে দেয়। আর আরো বেশি গুনাহ করার ইচ্ছাকে শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করে দেয়। তার অন্তর থেকে তাওবার ইচ্ছাকে দূর করে দেয়। একসময় সে পুরোপুরিভাবে তাওবাকে পরিত্যাগ করে। একসময় সে মিথ্যাবাদীদের মত শুধু মৌখিক ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ করে কিন্তু তার অন্তর থাকে গুনাহের সাথে বাঁধা। সে দিনরাত গুনাহ করতেই থাকে। আর এটিই হচ্ছে অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ। আর এটিই তাকে আসতে আসতে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

১৫. গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণাভাব দূর হয়ে যায় :

নিয়মিত গুনাহ করতে থাকলে গুনাহ গুনাহগারের অন্তর থেকে গুনাহের প্রতি ঘৃণাভাব দূর করে দেয়। ফলে সে আর গুনাহকে খারাপ কিছু মনে করে না। তার কাছে গুনাহের কাজগুলো স্বাভাবিক মনে হয়। তাকে গুনাহের কাজ করতে মানুষ দেখছে বা মানুষ তার খারাপ দিক নিয়ে সমালোচনা করছে তাতেও তার কিছুই আশে যায় না। সে কিছুই মনে করে না। তার অন্তরে গুনাহের প্রতি কোনো ঘৃণা জাগে না।

'যাকে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় ক'রে দেখানো হয়, অতঃপর সে সেটাকে উত্তম মনে করে (সে কি তার সমান, যে সৎ পথে পরিচালিত?) আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বিপথগামী করেন, আর যাকে ইচ্ছে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। কাজেই তাদের জন্য আক্ষেপ ক'রে, তুমি তোমার জীবনকে ধ্বংস হতে দিও না। তারা যা করে আল্লাহ তা খুব ভালভাবেই জানেন।'[১১১]

১৬. গুনাহ অন্তরকে গাফিল করে দেয় :

গুনাহগার যখন অতিমাত্রায় গুনাহ করতে থাকে তখন তার অন্তরে মোহর পড়ে যায়। ফলে তার অন্তরে ভালো কিছুর প্রভাব পড়ে না।

'আমি মানুষদের জন্য এ কুরআনে যাবতীয় দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। তুমি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আস তাহলে কাফিররা অবশ্য অবশ্যই বলবে- তোমরা মিথ্যে বলা ছাড়া আর কিছুই করছ না।
যাদের জ্ঞান নেই এভাবেই আল্লাহ তাদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন।'[১১২]

তখন সে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।তখন তার অন্তর থাকা সত্ত্বেও সে সেই অন্তর দ্বারা ভাল কিছু অনুভব করার ক্ষমতা রাখে না।তখন সে এক মিথ্যা জগতের মধ্যে পথ চলতে

থাকে ,অন্য মানুষ তাকে খারাপ থেকে ফিরে আসতে বললেও তার অন্তর আচ্ছাদিত হওয়ার এর কারনে সে তা মানতে নারাজ থাকে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সে ভুলে গেছে যা তার দু-হাত পেশ করেছে? নিশ্চয় আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা দিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে। আর তাদের কর্ণসমূহে রয়েছে বধিরতা এবং তুমি তাদেরকে হিদায়াতের প্রতি আহবান করলেও তারা কখনো হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না।‘[১১৩]

কখনো কখনো সে ভাল উপদেশ কে হাসি তামাশায় উড়িয়ে দেয়।সেই উপদেশকারীকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করে থাকে।

‘আর যারা কুফরী করে তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে কেবল উপহাসের পাত্র হিসেবে গ্রহণ করে। তারা বলে, ‘এ কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেবতাদের সমালোচনা করে?’ অথচ তারাই ‘রহমান’-এর আলোচনার বিরোধিতা করে।‘[১১৪]

‘তারপর তাদেরকে নিয়ে তোমরা ঠাট্টা করতে। অবশেষে তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করতে।’[১১৫]

উপরোল্লিখিত কুপ্রভাবগুলো ছাড়াও গুনাহের আরো অনেক কুপ্রভাব মানবজীবনে রয়েছে। অনেক প্রভাব রয়েছে যেগুলো শুধু ভুক্তভোগীই জানে এবং অনুভব করে। গুনাহের কুপ্রভাবে যেমন জীবন সংকীর্ণ ও কষ্টকর হয়ে যায় তেমনি গুনাহ থেকে মুক্তি জীবনকে করে উচ্ছ্বল, সফল ও সুখময়।[১১৬]

১৭। কাফেররা বিভ্রান্তিতে থাকে;

‘নিশ্চয় যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না আমি তাদের জন্য তাদের আমলসমূহকে সুশোভিত করে দিয়েছি। ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।‘[১১৭]

‘আমি তাকে ও তার কওমকে দেখতে পেলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। আর শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য সৌন্দর্যমন্ডিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত করেছে, ফলে তারা হিদায়াত পায় না’।[১১৮]

কুরআনের আলোকে পরকালে কাফেরদের পরিণতি ও অবস্থান

প্রত্যেক মুসলিম অমুসলিম মৃত্যুকে বিশ্বাস করে এবং প্রত্যেকেই জানে তা সত্য এবং আমরা এই পথের ই পথিক।তবে কাফেররা বিশ্বাস করে তাদেরকে পুনরায় আবার জীবিত করা হবে না ।তারা বিশ্বাস করে যে মৃত্যু ই জীবনের শেষ পরযায়।তবে তাদের জানা নেই যে মৃত্যু হচ্ছে এক জীবন শেষ করে আরেক জীবন অর্থাৎ পরকালে পদার্পণের একটি পর্যায় মাত্র। মৃত্যুর দ্বারা আরেকটি নতুন জীবনের সূচনা হয়।তাদের এই বিশ্বাস এর কথা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন,এবং তাদের প্রশ্নের জবাব ও দিয়েছেন।

‘আর কাফিররা বলে, ‘আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা মাটি হয়ে যাব তখনো কি আমাদেরকে উত্থিত করা হবে’? ইতোপূর্বে আমাদেরকে ও আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এ বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হয়েছিল, ‘এটি প্রাচীন লোকদের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়’।‘[১১৯]

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব।‘[১২০]

‘তিনিই জীবন্তকে বের করেন মৃত থেকে আর মৃতকে বের করেন জীবন্ত থেকে। যমীনকে তিনিই পুনরায় জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর, এভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে।‘[১২১]

‘আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে?’[১২২]

‘আর তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন, তারপর তিনিই তোমাদেরকে আবার জীবন দেবেন। নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।‘[১২৩]

রাসুল [সা] যখন কাফের সম্প্রদায়কে জাহান্নামের শাস্তির ভয় প্রদান করে সতর্ক করতে চাইতেন তখন কাফেররা রাসুল[সা] এর কাছে শাস্তি প্রদর্শন করতে চাইত,কেননা তারা

পরকালে বিশ্বাসী নয় তবে যারা পরকালে বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাস এই যে তারা মৃত্যুর পর স্বর্গ তথা জান্নাতে প্রবেশ করবে ,জাহান্নাম তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুল [স] এর উপর এর ব্যাপারে ওহি নাযিল করেন।

'তারা তোমাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি আনতে বলে। ('আযাবের) সময়কাল যদি না নির্ধারিত থাকত তবে তাদের উপর শাস্তি অবশ্যই এসে পড়ত। তা তাদের উপর অবশ্য অবশ্যই আসবে আকস্মিকভাবে, তারা (আগেভাগে) টেরও পাবে না।তারা তোমাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি আনতে বলে। জাহান্নাম কাফিরদেরকে ঠিকই ঘেরাও করে ফেলবে। সেদিন 'আযাব তাদেরকে ঢেকে নেবে তাদের উপর থেকে আর তাদের পায়ের নীচে হতে। আল্লাহ্ বলবেন- তোমরা যা করতে তার স্বাদ ভোগ কর।'[১২৪]

এমনকি কাফেররা বিশ্বাস করত যে, তাদের উপর কখনোই কিয়ামত সংগঠিত হবে না।তাদের কখনোই শাস্তি দেয়া হবে না। তাদের অধিক সম্পদ তাদের সন্তান তাদের আযাব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। কিন্তু দুনিয়ার এই সম্পদ ,সন্তান,সন্ততি এসব কিছুই জাহান্নামের আগুন থেকে তাদের রক্ষা করতে সক্ষম না এবং হবেও না।আল্লাহ তায়ালা তাদেরই এসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন,

'কাফিরগণ বলে- ক্বিয়ামত আমাদের নিকট আসবে না। বল, না, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদের নিকট তা অবশ্য অবশ্যই আসবে। তিনি যাবতীয় অদৃশ্যের জ্ঞানী। তাঁর থেকে লুক্কায়িত নেই আকাশ ও পৃথিবীতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুকণা, না তার থেকে ছোট আর না তার থেকে বড় (কোনটাই নেই লুক্কায়িত)। সবই আছে (লাওহে মাহফুয নামক) এক সুস্পষ্ট কিতাবে।'[১২৫]

'তারা বলত- ধন-মাল আর বাল-বাচ্চায় আমরা বেশি, আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হতে পারি না।'

তারা আরো বলেছে, 'আমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অধিক সমৃদ্ধশালী। আর তাই আমরা আযাবপ্রাপ্ত হব না'।[১২৮]

তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের উদ্দেশ্য করে বলবেন,

'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কোন কাজে লাগবে না এবং তারাই আগুনের ইন্ধন।'[১২৬]

‘তারা বলে, ‘গুটি কয়েক দিন ছাড়া আগুন কক্ষনো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না’। বল, ‘তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছো যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ভঙ্গ করবেন না? কিংবা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না’।[১২৭]

‘তারা যে জন্য অপেক্ষা করছে সেটাতো একটা প্রচন্ড শব্দ যা তাদেরকে পাকড়াও করবে যখন তারা নিজেদের মধ্যে বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত থাকবে।(ক্বিয়ামত এমনই হঠাৎ আক্রমণ করবে যে) তারা না পারবে ওসীয়াত করতে আর না পারবে তাদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যেতে।

আর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা ক্বরর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে আসবে।

তারা বলবে, ‘হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমাদেরকে আমাদের ঘুমের জায়গা থেকে কে উঠালো? (তাদেরকে জবাব দেয়া হবে) ‘‘এটা হল তাই- দয়াময় আল্লাহ যার ও‘য়াদা দিয়েছিলেন, আর রসূলগণও সত্য কথাই বলেছিলেন।’[১২৯]

‘যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলেঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন।‘[১৩০]

‘যেদিন তারা ফেরেশতাদের দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না। আর তারা বলবে, ‘হায় কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত’ । [১৩১]

‘প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে;............’[১৩২]

মৃত্যুর পর সকলের হিসাব নিকাশ নেয়ার পর ইমান আনার পর যারা শিরক ও কুফরি ব্যতিত অন্য যে গুনাহ করেছে তার জন্য তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে , নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করার পর মুমিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না।তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত ,যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নদ নদী ।তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ কঙ্কনে অলংকৃত করা হবে।এবং তারা পরবে সূক্ষ ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে,; কতই না চমৎকার প্রতিদান এবং কতই না উত্তম আশ্রয় স্থল।‘[১৩৩]

তবে যে ব্যক্তি শিরক ও কুফরি করেছে এবং তাওবা না করেই মৃত্যু বরণ করেছে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে।আর তাদের ভাল কাজের ফলস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরিচিকার মত, পিপাসিত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার কাছে আসবে, তখন সে দেখবে সেটা কিছুই নয়। আর সে সেখানে আল্লাহকে দেখতে পাবে। অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পরিপূর্ণ করে দেবেন। আর আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'[১৩৪]

কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ আয়াতে 'সেখানে' বলে দুনিয়াই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কারণ, আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফেরদের কর্মকাণ্ডের যাবতীয় প্রতিফল দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হবে। যেমনিভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

"যে কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি ওদের কাজের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। ওদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছুই নেই এবং ওরা যা করে আখিরাতে তা নিস্ফল হবে এবং ওরা যা করে থাকে তা নিরর্থক।" [১৩৫]

অন্যত্র এসেছে,

"যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই, আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না।" [১৩৬]

তবে অধিকাংশ আলেমদের নিকট এ আয়াতে "সেখানে" বলে আখেরাতে মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিতির কথা বুঝানো হয়েছে। সেখানে তারা দুনিয়াতে যা করেছে সেটার প্রতিফল যদি প্রাপ্য হতো তবে তা দেয়া হতো। কিন্তু যেহেতু তাদের কৃত যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট হয়েছে সেহেতু তারা সেখানে কিছুই পাবে না। যেমন, অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ

"আর আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।" [১৩৭][১৩৮] [তাফসীরে জাকারিয়া]

'অথবা (তাদের আমলসমূহ) গভীর সমুদ্রে ঘনিভূত অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউয়ের উপরে ঢেউ, তার উপরে মেঘমালা। অনেক অন্ধকার; এক স্তরের উপর অপর স্তর।

কেউ হাত বের করলে আদৌ তা দেখতে পায় না। আর আল্লাহ যাকে নূর দেন না তার জন্য কোন নূর নেই।'[১৩৯]

এটি দ্বিতীয় উপমা, তাদের আমল অন্ধকারের ন্যায়। অর্থাৎ, তাদের আমলগুলি মরীচিকার মত অথবা অন্ধকারের মত। অথবা আগের উপমা ছিল কাফেরদের আমলের। আর এটি তাদের কুফরের উপমা, যার মধ্যে একজন কাফের সারা জীবন নিমজ্জিত থাকে। কুফর, অবিশ্বাস, অস্বীকার, মিথ্যাজ্ঞান ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার, নিকৃষ্ট আমল ও শিরকী বিশ্বাসের অন্ধকার এবং প্রতিপালক ও তাঁর পরকালের আযাব সম্বন্ধে অজ্ঞানতার অন্ধকার। এই সমস্ত অন্ধকার তাকে হিদায়াতের কোন পথই দেখতে দেয় না; যেমন অন্ধকারে মানুষ তার নিজের হাতও দেখতে পায় না।[১৪০]

যখন কাফের সম্প্রদায় আযাব স্বচক্ষে প্রদর্শন করবে তখন তারা চিৎকার করতে থাকবে আর জাহান্নাম এর আযাব থেকে বাচার জন্য কাকুতি মিনতি করতে থাকবে ,কিন্তু তখন তাদের এই আফসোস ,হাহাকার এমনকি ইমান আনাও তাদের কোনো কাজে আসবে না।

'আর সেদিন যালিম নিজের হাত দু'টো কামড়িয়ে বলবে, 'হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম'!' [১৪১]

'সেখানে তারা চিৎকার করে বলবে- হে আমাদের পালনকর্তা! বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, আমরা যে কাজ করতাম তা করব না। আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি যে, তখন কেউ নসীহত গ্রহণ করতে চাইলে নসীহত গ্রহণ করতে পারতে? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। কাজেই শাস্তি ভোগ কর, যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।'[১৪২]

তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলবেন,

'এটাই তাদের প্রতিফল-জাহান্নাম, কারণ তারা কুফুরী করেছে আর আমার নিদর্শন ও রসূলদেরকে হাসি-তামাশার বিষয় বানিয়েছে।'[১৪৩]

'ফলে আজ তোমাদের একে অপরের কোন উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা কেউ রাখবে না। আর আমি যালিমদের উদ্দেশ্যে বলব, 'তোমরা আগুনের আযাব আস্বাদন কর যা তোমরা অস্বীকার করতে।'[১৪৪]

'আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন আর তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন।'[১৪৫]
'কিয়ামাত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়।' [১৪৬]

'এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাকে অধঃ মুখে নিক্ষেপ করা হবে আগুনের মধ্যে ।তোমরা যা করছিলে তার ই প্রতিফল তোমরা পাবে।'[১৪৭]

'যারা কুফরের পথ অবলম্বন করেছে তুমি কিছুতেই তাদেরকে মনে করো না পৃথিবীতে (কোথাও পালিয়ে গিয়ে) তারা আমাকে অক্ষম করে দেবে। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ ঠিকানা।'[১৪৮]

'হায়, কাফিররা যদি সে সময়ের কথা জানত, যখন তারা তাদের সামনে ও পেছন থেকে আগুন ফিরাতে পারবে না। আর তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না;'[১৪৯]

কেননা কাফেরদের কুফরি আল্লাহর মধ্যে ক্রোধ সৃষ্টি করে থাকে ,যার জন্য তারা আল্লাহর অভিশাপ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্লাহ তায়ালা বান্দার যেকোনো অপরাধ বান্দার ক্ষমা প্রার্থনা করার দ্বারা মাফ করে থাকেন ,তবে আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার ,যা আল্লাহ তায়ালার বৈশিষ্টের মধ্যে নেই এমন সব কথা দ্বারা কুফরি করা আল্লাহ তায়ালা মাফ তো করেন নি না বরং দুনিয়াতেই এর জন্য আযাব এর সম্মুখীন করেন।

'তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে (নিজের) প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফুরী করবে তার কুফুরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফর তাদের প্রতিপালকের ঘৃণাই বৃদ্ধি করে। কাফিরদের কুফর তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।'[১৫০]

কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তারা যাদের উপাসনা করত তাদেরকে ডাকতে বলা হবে তখন তাদের ডাকে কেউ ই সাড়া দেবে না,কেননা তাদের মানা দেব দেবী ,উপাসক এরা না নিজেদের জীবনের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত না অন্যদের ,এবং এরা তো মাটির তৈরি মূর্তি ব্যতিত আর কিছুই নয়,আর সেদিন কিয়ামতের মাঠে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য হাহাকার করব,কেউই কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না,

'যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবেঃ হে আমাদের রাব্ব! এদেরকেও আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম, যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম; আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি চাচ্ছি। এরা আমাদের ইবাদাত করতনা।আর বলা হবে, 'তোমাদের দেবতাগুলোকে

ডাক, অতঃপর তারা তাদেরকে ডাকবে, তখন তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর তারা আযাব দেখতে পাবে। হায়, এরা যদি সৎপথ প্রাপ্ত হত! আর সেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা রাসূলদেরকে কী জবাব দিয়েছিলে'? অতঃপর সেদিন সকল সংবাদ তাদের কাছ থেকে গোপন হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না।'[কেননা, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, তারা সকলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।][১৫১][১৫২]

'তাদের দেব-দেবীগুলো তাদের জন্য সুপারিশ করবেনা এবং তারাই তাদের দেব-দেবীগুলোকে অস্বীকার করবে।'[১৫৩]

'তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না আর যদি শুনেও, তবুও তোমাদের (ডাকে) সাড়া দিতে পারবে না। আর তোমরা যে তাদেরকে (আল্লাহর) অংশীদার গণ্য করতে, ক্বিয়ামতের দিন তা তারা অস্বীকার করবে। কেউই তোমাদেরকে সর্বজ্ঞ আল্লাহর মত খবর জানাতে পারবে না।'[১৫৪]

কাফেরদেরকে যথাসম্ভব অধিক কষ্টে নিপতিতি করে টানতে টাণতে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে,তারা হাজারো চিৎকার করলেও তাদের জন্য থাকবে না কোনো সাহায্য কারী।কেনানা তারা যাদের কে নিজেদের জন্য সাহায্যকারী হিসেবে মানত তারা তো নিতান্তই এক মূর্তি এবং আল্লাহর তৈরি সৃষ্টি [গরু,বানর,গাছ]।

'আগুনে যেদিন তাদের মুখ উপুড় করে দেয়া হবে সেদিন তারা বলবে- হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রসূলকে মানতাম।'[১৫৫]

'যাদেরকে মুখের উপর ভর দেয়া অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে। এরা মর্যাদায় অধিক নিকৃষ্ট এবং পথের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট।'[১৫৬]

'আর আমি জাহান্নামকে করেছি কাফিরদের জন্য কয়েদখানা।'[১৫৭]

কাফেরদের শাস্তি স্বরূপ বিভিন্ন বিষয় আল্লাহ তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন,তাদেরকে জাহান্নামে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে ,তাদেরকে সেখানে কাটাযুক্ত ফল ও গাছ ভক্ষণ করানো হবে। পিপাসা প্রাপ্ত হলে পানির বদলে তাদেরকে জাহান্নামিদের গায়ের ঘাম খাওয়ানো হবে।এমন সব পানি সমূহ খাওয়ানো হবে যা তাদের পিপাসা নিবারনের জায়গায় তাদের গলা ও পেটের নাড়ী ভুঁড়ি ঝলসে দিবে তবুও তারা তা খেতে থাকবে আল্লাহর ইচ্ছায়।

‘ অতএব যারা কুফরি করেছে তাদের জন্য পোশাক তৈরি করা হয়েছে আগুন দিয়ে । তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে ।যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং চর্ম বিগলিত করা হবে।তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি ।তারা যখনি যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে ,তখনই তাদের তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে।বলা হবে দহন যন্ত্রণা আস্বাদন কর ।‘[১৫৮]

জাহান্নামের আগুনে তাদের চেহারা ভয়ানক রূপ ধারন করবে,তারা পানি পিপাসায় কারতরাবে তবুও তাদের পানি দেয়া হবে না,তাদেরকে এমন সব খাবার খাওয়ানো হবে যা তারা গিলতে না পারলেও আল্লাহর হুকুমে তারা সেগুলোই খাবে এবং পান করবে,

‘আগুন তাদের চেহারা দগ্ধ করবে, সেখানে তারা হবে বীভৎস চেহারাবিশিষ্ট।‘[১৫৯]

‘নিশ্চয়ই যাক্কুম গাছ (হবে) পাপীর খাদ্য; গলিত তামার মত পেটে ফুটতে থাকবে।ফুটন্ত পানির মত(বলা হবে) ‘ওকে ধর, অতঃপর তাকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাও’।তারপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও।(বলা হবে) ‘তুমি আস্বাদন কর, নিশ্চয় তুমিই সম্মানিত, অভিজাত’।নিশ্চয় এটা তা-ই যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে।‘[১৬০]

‘তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। টগবগে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে তাদেরকে পান করানো হবে। তাদের জন্য কাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না। তা মোটা-তাজাও করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না।[১৬১]

‘তাদের পোশাক হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের চেহারাসমূহকে ঢেকে ফেলবে।‘[১৬২]

যখন জাহান্নামিরা এসব কষ্টদায়ক শাস্তি থেকে আল্লাহ তায়ালার কাছে কাকুতি মিনতি করে আবারো দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে, দুনিয়াতে তারা ইমান এনে আল্লাহ তায়ালার পথে চলবে এই বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে তারা আবারো দুনিয়াতে ফিরে আসার কাকুতি জানাবে আল্লাহ তায়ালার কাছে ,তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন,

‘হে আমাদের রাব্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব।‘

'যাতে কাউকেও বলতে না হয়, 'হায় আফসোস! আল্লাহর হক আদায়ে আমি যে শৈথিল্য করেছিলাম তার জন্য। আর আমি কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম'। অথবা যাতে কাউকে একথাও বলতে না হয়, 'আল্লাহ যদি আমাকে হিদায়াত দিতেন তাহলে অবশ্যই আমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'।অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় যাতে কাউকে একথাও বলতে না হয়, 'যদি একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ আমার হত, তাহলে আমি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'।[১৬৩]

'আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই থাক, আর আমার সাথে কথা বলো না।'[১৬৪]

তিনি আরো বলেছেন,

'হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলোকে অস্বীকার করেছিলে এবং তুমি অহঙ্কার করেছিলে। আর তুমি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।'[১৬৫]

'কাফিরদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হবেঃ তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদের ঈমানের প্রতি আহবান করা হয়েছিল, আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে। তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। অতঃপর আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব (জাহান্নাম থেকে) বের হবার কোন পথ আছে কি'? [তাদেরকে বলা হবে] 'এটা তো এজন্য যে, যখন আল্লাহকে এককভাবে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে আর যখন তাঁর সাথে শরীক করা হত তখন তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহর'। [১৬৬]

কাফেরদের অবস্থা যখন আরো খারাপ হতে থাকবে ,তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কোনো ভাবেই জাহান্নাম থেকে বের করবেন না ,তখন জাহান্নামিরা তথা কাফেররা নিজেদের দেব দেবী মূর্তি পূজারকদের দোষারোপ করতে থাকবে,

'আর তারা বলবে- হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতাদেরকে ও আমাদের প্রধানদেরকে মান্য করতাম। তারাই আমাদেরকে গুমরাহ করেছিল।
হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও আর তাদেরকে মহা অভিশাপে অভিশাপ দাও।'

‘যখন তাদেরকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হব এতখন তাদের আর কোনো কথা বলার ক্ষমতা থাকবে না ,তাদের হাত তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ,তাদের মুখ আল্লাহ তায়ালার সাথে কথা বলবে,

‘আর যেদিন আল্লাহর দুশমনদেরকে আগুনের দিকে সমবেত করা হবে তখন তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে।অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।আর তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, ‘কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে’? তারা বলবে, ‘আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।‘[১৬৭]

‘আর কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত’? তারা বলবে, ‘অবশ্যই এসেছিল’; কিন্তু কাফিরদের উপর আযাবের বাণী সত্যে পরিণত হল। বলা হবে, ‘তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, তাতেই স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। অতএব অহঙ্কারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট’!’[১৬৮]

‘এটা এজন্যই যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল’। সুতরাং আজ তাদেরকে তা (জাহান্নাম) থেকে বের করা হবে না এবং তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে না।‘[১৬৯]

‘যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে-ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে।তারপর তাদেরকে বলা হবে, ‘কোথায় তারা, যাদেরকে তোমরা শরীক করতেআল্লাহ ছাড়া’? তারা বলবে, ‘তারা তো আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে’, বরং এর পূর্বে আমরা কোন কিছুকে আহবান করিনি’। এভাবেই আল্লাহ কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করেন।এটা এ জন্য যে, তোমরা যমীনে অযথা উল্লাস করতে এবং এজন্য যে, তোমরা অহঙ্কার করতে। ‘[১৭০]

এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামিদের জাহান্নামের অবস্থা নিয়ে আরেকটি সুরা তে বর্ণনা করেন,

'অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব। তুমি কি জান সাকার কি? এটা অবশিষ্টও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না। চামড়াকে দগ্ধ করে কালো করে দেবে। সেখানে নিয়োজিত আছে ঊনিশ জন ফেরেশতা।'[১৭১]

কুরআনের আলোকে কাফের সম্প্রদায় এর কিছু দৃষ্টান্ত

আমাদের রাসুল[স] এর যুগ এর ও অনেক আগে থেকেই কাফেরদের অবস্থান এই দুনিয়াতে ছিল যা আমরা আল্লাহ তায়ালার কিতাব আল কুরআন থেকে জেনে থাকি,এই কাফের সম্প্রদায়ের সম্পর্কে আমরা এখানে আল কুরআনের মাধ্যমে কিছু ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করব ইন শা আল্লাহ।

ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়

'নিশ্চয় ফির'আউন (মিশর) দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার অধিবাসীকে নানা দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একদলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল, যাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত আর কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। নিশ্চয় সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম।'[১৭২]

এর ব্যাখ্যা স্বরূপ তাফসির হল,

যুলুম ও অত্যাচারের বাজার গরম করে রেখেছিল, আর সে নিজেকে বড় উপাস্য বলে ঘোষণা করেছিল। যাদের উপর ভিন্ন ভিন্ন কাজ ও কর্তব্য ন্যস্ত ছিল।

এ থেকে বানী ইস্রাঈলদেরকে বুঝানো হয়েছে; যারা ছিল সে কালের সর্বোত্তম জাতি। কিন্তু আল্লাহর পরীক্ষা স্বরূপ তারা ফিরআউনের দাসে ও তার অত্যাচারের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

যার কারণ হল, কিছু জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, বানী ইস্রাঈলদের মধ্যে এমন এক সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, যার হাতে ফিরআউন ও তার রাজত্ব ধ্বংস হবে। যার প্রতিকার ছিল তার নিকট এই যে, তাদের মধ্যে প্রতিটি নবজাত পুত্র-সন্তানকে হত্যা করে দেওয়া

হবে। অথচ সে নির্বোধ এ চিন্তা করেনি যে, যদি জ্যোতিষী সত্যবাদী হয়, তাহলে তা হবেই; যদিও সে সন্তানদের হত্যা করতে থাকে। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে সন্তান হত্যার আদেশের কোনই প্রয়োজন ছিল না। (ফাতহুল কাদীর) কেউ কেউ বলেন, ইবরাহীম (আঃ) হতে এ সুসংবাদ প্রচার হয়ে আসছিল যে, তাঁরই বংশে এক সন্তান জন্ম-গ্রহণ করবে, যার হাতে মিসর রাজ্য ধ্বংস হবে। কিবত্বীরা এ সংবাদ বানী ইস্রাঈলদের নিকট হতে শোনার পর তা ফিরআউনের নিকট পৌঁছে দেয়। যার জন্য সে বানী ইস্রাঈলদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করতে শুরু করে।[১৭৩][১৭৪] (ইবনে কাসীর)

'অতঃপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসল, তখন তারা বলল, 'এ তো মিথ্যা যাদু ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এরূপ কথা আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যেও শুনিনি'।[১৭৫]

'আর ফির'আউন ও তার সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না।'অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তারপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব, দেখ যালিমদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল?'

'আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা জাহান্নামের দিকে আহবান করত এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।'এ যমীনে আমি তাদের পিছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি আর কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত।'[১৭৬]

কারুন সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত আয়াত

'নিশ্চয় কারূন ছিল মূসার কওমভুক্ত। অতঃপর সে তাদের উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অথচ আমি তাকে এমন ধনভান্ডার দান করেছিলাম যে, নিশ্চয় তার চাবিগুলো একদল শক্তিশালী লোকের উপর ভারী হয়ে যেত। স্মরণ কর, যখন তার কওম তাকে বলল, 'দম্ভ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিকদের ভালবাসেন না'। সে বলল, 'আমি তো এই ধনভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছি আমার কাছে থাকা জ্ঞান দ্বারা'। সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা ছিল তার থেকে শক্তিমত্তায় প্রবলতর এবং জনসংখ্যায় অধিক। আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। অতঃপর সে তার কওমের

সামনে জাঁকজমকের সাথে বের হল। যারা দুনিয়ার জীবন চাইত তারা বলল, ‘আহা! কারূনকে যেমন দেয়া হয়েছে আমাদেরও যদি তেমন থাকত! নিশ্চয় সে বিরাট সম্পদশালী।’[১৭৭]

‘অতঃপর আমি কারূন ও তার প্রাসাদকে মাটিতে দাবিয়ে দিলাম। তখন তার জন্য এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না।‘[১৭৮]

‘(স্মরণ কর) কারূন, ফেরাউন ও হামানের কথা। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, অতঃপর তারা পৃথিবীতে অহংকার করল, কিন্তু তারা (আমাকে পেছনে ফেলে) আগে বেড়ে যেতে পারেনি।‘[১৭৯]

লূত [আ] এর সম্প্রদায় এর পরিণতি

লূত [আ] এর সম্প্রদায় এক ভয়ানক ফিতনার মধ্যে ডুবে ছিল,আর তা হল সমকামিতা,যার জন্য তার পুরো সম্প্রদায়কে আসমানে উঠিয়ে উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল,যার বর্ণনা আমরা কুরআনে পেয়ে থাকি,

‘স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল- তোমরা দেখে-শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ,
তোমরা কি কাম আসক্তি মিটানোর জন্য নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের নিকট গমন কর? তোমরা এমন এক জাতি যারা মূর্খের আচরণ করছ।‘[১৮০]

‘স্মরণ কর লূতের কথা, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল- অবশ্যই তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বজগতে কেউ করেনি।‘[১৮১]

“অতঃপর তাদেরকে সূর্যোদয়ের সময়েই এক বিকট আওয়াজ পাকড়াও করলো। এরপরই আমরা জনপদটিকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। আর উক্ত জনপদটি (উহার ধ্বংস স্তূপ) স্থায়ী তথা বহু প্রাচীন লোক চলাচলের পথি পার্শ্বেই এখনও বিদ্যমান। অবশ্যই এতে রয়েছে মুমিনদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন।” [১৮২]

যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে এসব থেকে ফিরে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন তখন তারা তা প্রত্যাখান করল এবং তারা সেই ভয়ানক গুনাহ করতে থাকল,আর তখন ই আল্লাহ তায়ালার আসমানি আযাব তাদের উপর পতিত হল,

‘তখন তার সম্প্রদায়ের এ কথা বলা ছাড়া আর কোন জওয়াব ছিল না যে, তোমাদের জনপদ থেকে লূতের পরিবারবর্গকে বের করে দাও, এরা এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়। অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম, তার স্ত্রী ব্যতীত। আমি তার ভাগ্য ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে নির্ধারণ করেছিলাম।আর আমি তাদের উপর বর্ষিয়ে ছিলাম এক ভয়ংকর বৃষ্টি। ভীতি প্রদর্শিতদের উপর এ বৃষ্টি ছিল কতই না মন্দ!’[১৮৩]

‘তোমরা (কাম-তাড়িত হয়ে) পুরুষদের কাছে যাও, রাহাজানি কর এবং নিজেদের মজলিসে ঘৃণ্য কর্ম কর। তার সম্প্রদায়ের এ কথা বলা ছাড়া কোন জওয়াব ছিল না যে, তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের উপর আল্লাহর ‘আযাব নিয়ে এসো।‘[১৮৪]
“অতঃপর যখন আমার ফরমান জারি হলো তখন ভূ-খণ্ডটির উপরিভাগকে নিচু করে দিলাম এবং ওর উপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা ছিলো একাধারে এবং যা বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিলো আপনার রবের ভাণ্ডারে। আর উক্ত জনপদটি এ যালিমদের থেকে বেশি একটা দূরে নয়।” [১৮৫]

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে আসমানি আযাব দিলেন,

‘আমরা এ জনপদের বাসিন্দাদের উপর আসমানী শাস্তি নাযিল করব, কারণ তারা ছিল পাপাচারে লিপ্ত।‘[১৮৬]

শুয়াইব [আ] এর সম্প্রদায়

শুয়াইব [আ] কে আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করেন মাদইয়ানবাসীদের নিকট।তারা শুয়াইব[আ] এর আহবান কে না মেনে তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেন যার দৃষ্টান্ত আমরা কুরআনে দেখতে পাই,

‘মাদইয়ানের বাসিন্দাদের কাছে আমি তাদের ভাই শু‘আয়বকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল- হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদাত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর, পৃথিবীতে ফাসাদ

সৃষ্টি কর না। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যে ব'লে অস্বীকার করল, অতঃপর মহা কম্পন তাদেরকে পাকড়াও করল আর তারা নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে শেষ হয়ে গেল।'[১৮৭]

সাবা'র অধিবাসী

'সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে একটা নিদর্শন ছিল- দু'টো বাগান; একটা ডানে, একটা বামে। (তাদেরকে বলেছিলাম) তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযক ভোগ কর আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। সুখ-শান্তির শহর আর ক্ষমাশীল পালনকর্তা।কিন্তু তারা (আল্লাহ হতে) মুখ ফিরিয়ে নিল। কাজেই আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যা, আর আমি তাদের বাগান দু'টিকে পরিবর্তিত করে দিলাম এমন দু'টি বাগানে যাতে জন্মিত বিস্বাদ ফল, ঝাউগাছ আর কিছু কুল গাছ।
অকৃতজ্ঞতাভরে তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আমি অকৃতজ্ঞদের ছাড়া এমন শাস্তি কাউকে দেই না।'[১৮৮]

উপরের সকল ঘটনা থেকে আমরা আল্লাহ তায়ালার কঠিন শাস্তির বিষয়ে জানতে পারি।আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার প্রতি যেমন দয়াময়,পরম করুনাময়,দয়াশীল,স্নেহশীল ,ঠিক তেমনই তিনি তার বিরুদ্ধে কাফের মুশরিক ,অবিশ্বাসীদের প্রতি শাস্তি প্রদানে কঠোর।আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ওদের প্রত্যেককেই আমি তার পাপের কারণে পাকড়াও করেছিলাম। তাদের কারো প্রতি আমি পাঠিয়েছিলাম পাথরসহ ঝটিকা, কারো প্রতি আঘাত হেনেছিল বজ্রের প্রচন্ড আওয়াজ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছি ভূগর্ভে আর কাউকে দিয়েছিলাম ডুবিয়ে। তাদের প্রতি আল্লাহ কোন যুলম করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলম করেছিল।'[১৮৯]

'আবূ বকর ইবনু আবূ শায়বা (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আকাশমণ্ডলী গুটিয়ে নিবেন। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে ডান হস্তে ধরে বলবেন, আমিই বাদশাহ। কোথায় প্রতাপশালী লোকেরা, কোথায় অহংকারীরা? এরপর তিনি বাম হস্তে সমস্ত জমিন গুটিয়ে নিবেন এবং বলবেন, আমিই বাদশাহ। কোথায় প্রতাপশালী লোকেরা, কোথায় অহংকারীরা?'[১৯০]

নূহ [আ] এর সম্প্রদায়

'তাদের আগে নূহের জাতিও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা আমার বান্দাহকে অস্বীকার করেছিল আর বলেছিল- "একটা পাগল"; আর তাকে ভয় দেখানো হয়েছিল।

'অতঃপর সে তার রবকে আহবান করল যে, 'নিশ্চয় আমি পরাজিত, অতএব তুমিই প্রতিশোধ গ্রহণ কর'।

ফলে আমি বর্ষণশীল বারিধারার মাধ্যমে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিলাম।

আর ভূমিতে আমি ঝর্না উৎসারিত করলাম। ফলে সকল পানি মিলিত হল নির্ধারিত নির্দেশনা অনুসারে।

আর আমি তাকে (নূহকে) কাঠ ও পেরেক নির্মিত নৌযানে আরোহণ করালাম।

যা আমার চাক্ষুস তত্ত্বাবধানে চলত, তার জন্য পুরস্কারস্বরূপ, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।'[১৯১]

আদ ও সামুদ জাতি

'আদ ও সামূদ জাতি সেই আকস্মিকভাবে সংঘটিতব্য মহাবিপদকে মিথ্যে বলেছিল। আর সামূদ সম্প্রদায়, তাদেরকে বিকট শব্দ দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। আর 'আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচন্ড ঠান্ডা ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। তিনি তাদের উপর তা সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে সেখানে লুটিয়ে পড়া অবস্থায় দেখতে পেতে যেন তারা সারশূন্য খেজুর গাছের মত।[১৯২]

কুফর এর শাস্তি থেকে নাজাতের উপায়

কবিরা গুনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক গুনাহ হচ্ছে কুফর ও শিরক। আল্লাহ তায়ালা সকল গুনাহ তার দয়ার দ্বারা ক্ষমা করে থাকেন,যদিও সে তাওবা না করে এই দুটি ব্যতিত।কাফের ও শিরককারী যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীনে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো আমল,কোন তাওবা কবুল করা হবে না তাই একজন কাফেরকে সর্ব প্রথম আল্লাহর দ্বীনে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করতে হবে।আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে মু'মিনগণ! ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শায়ত্বনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[১৯৩]

'বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসকল ক্ষমা করবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।[১৯৪]

'আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন এবং কাফিরদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত, সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই আগুনের বাসিন্দা, এরা চিরকাল সেখানে থাকবে।'[১৯৫]

প্রথমত, কেউ যদি কুফর ,শিরক করেন,যদি অনুতপ্ত হয়ে খালিস দিলে তাওবা না করে তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে কোন দিন ক্ষমা করবেন না।তাই কুফর এর শাস্তি থেকে বাচার উপায় হল আল্লাহ তায়ালার কাছে খালিস দিলে তাওবা করা।কেননা আল্লাহ তায়ালার প্রতি যে বান্দা তাওবা করে আল্লাহ তায়ালা অনেক খুশি হন যেমনটা আমরা হাদিসে দেখতে পাই এবং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

'আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ্ ইবনু কা'নাব আল কা'নবী (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কোন লোক হারানো প্রাণী পাওয়ার পর যে সমান আনন্দিত হয়, তোমাদের তাওবার কারণে আল্লাহ তা'আলা এর চেয়েও বেশি খুশী হন।'[১৯৬][১৯৭]

তাছাড়া আল্লাহ তাওবা কারীদের ভালোবাসেন,

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালবাসেন আর পবিত্রতা অবলম্বীদেরকেও ভালবাসেন।‘[১৯৮]

‘নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং সেই কাফির অবস্থায়ই মারা যায়, তাদের কেউ পৃথিবী-ভরা স্বর্ণও বিনিময় স্বরূপ প্রদান করতে চাইলে তা তার কাছ থেকে কক্ষণো গ্রহণ করা হবে না। এরাই তারা যাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।‘[১৯৯]

‘আল্লাহ কীরূপে সেই সম্প্রদায়কে সুপথ দেখাবেন যারা ঈমান আনার পর, এ রসূলকে সত্য বলে স্বীকার করার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল আসার পর কুফরী করে? বস্তুতঃ আল্লাহ যালিম কওমকে পথ দেখান না।
কিন্তু এরপর যারা তাওবাহ করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে তারা ব্যতীত। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।‘[২০০]

‘কিন্তু যারা তাওবাহ করে এবং সংশোধন করে নেয় এবং (সত্যকে) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তাদের তাওবাহ আমি কবুল করি, বস্তুতঃ আমি অত্যধিক তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু।‘[২০১]

‘হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।‘[২০২]

‘যা কিছু আকাশসমূহে ও ভূমন্ডলে আছে, সবকিছু আল্লাহরই। তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা তোমরা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন। সুতরাং যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।‘[২০৩]

কেউ যদি ইসলামে পূর্ণ ভাবে প্রবেশ করে তাওবা করে তবে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা তার অনুগ্রহ দ্বারা তাকে মাফ করে দিবেন।কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘তিনি যাকে ইচ্ছে নিজের দয়ার জন্য খাস করে বেছে নেন এবং আল্লাহ মহা কল্যাণের অধিকারী।‘[২০৪]

‘বল, ‘হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।[২০৫]

‘আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে ? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না।‘[২০৬]

হাদিসে এসেছে,

কুতাইবাহ্ ইবনু সাঈদ (রহঃ) ... আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন আল্লাহ তা’আলা মাখলুক সৃষ্টি করলেন তখন তিনি তার কিতাবে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তা তার নিকট আরশের উপরে রয়েছে। (তিনি লিখেছে) আমার গোস্বার উপর রহমত বিজয়ী থাকবে। [২০৭][২০৮]

‘যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, নামায কায়িম করে এবং যাকাত আদায় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট সওয়াব নির্ধারিত আছে। তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও না।‘[২০৯]

দ্বিতীয়ত হল ইসেগফারে অধিক সময় ব্যয় করা।

প্রত্যেক মুমিন বান্দার অবশ্য কর্তব্য হল তার অবসর সময়কে আল্লাহর ইবাদতে কাটানো।তার জন্য সবচেয়ে উপকারী ইবাদত হচ্ছে অধিক হারে ইস্তেগফারে লিপ্ত থাকা।কেননা আমাদের প্রিয় রসুল[সা] এর অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের সকল গুনাহ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেয়া সত্ত্বেও তিনি প্রতিদিন ৭০ এর অধিক বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন,তবে কেন আমরা আল্লাহর গাফেল বান্দা হয়েও আল্লাহর যিকির থেকে নিজেরা মাহরুম হয়ে থাকব।

হযরত আবু হোরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেন আমি বলতে রাসুল [সা] কে বলতে শুনেছি ,'আল্লাহর কসম আমি দিনের মধ্যে ৭০ বারেরও অধিক মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তাওবা করি।'[অন্য বর্ণনায় ১০০ বারেরও অধিক বলা আছে][২১০]

যারা পাপ করেছে নিজেদের উপর যুলুম করেছে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন,
'পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তি প্রদানকারী, অনুগ্রহ বর্ষনকারী। তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। ফিরে যাওয়া তারই কাছে।'[২১১]

যারা ইস্তেগফারে অধিক সময় ব্যয় করে তাদের জন্য পরকালে রয়েছে সফলতা।

আবদ ইবনু বুসর [রা] বলেন, রাসুল[সা] বলেছেন,' সেই ই সৌভাগ্যবান ,যে তার আমল নামায় অনেক ইস্তেগফার পেয়েছে।'[২১২]

আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্যে অনেকেই আমরা আছি যারা প্রতি নিয়ত একই গুনাহে লিপ্ত।যার থেকে আমরা তাওবা করা সত্ত্বেও আমরা আবারো শয়তান ও নফসের প্ররোচনায় পড়ে সেই গুনাহের দিকে ধাবিত হই,এই অবস্থায় যদি আমরা প্রত্যেকবার গুনাহের পর প্রত্যেকবার আল্লাহর নিকট খালিস দিলে ক্ষমা প্রার্থনা করি ,সে ব্যাপারে আমাদের রাসুল[সা] হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে,

'আবদুল আ'লা ইবনু হাম্মাদ (রহঃ) ..... আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় রব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক বান্দা পাপ করে বলল, হে আমার রব! আমার পাপ মার্জনা করে দাও। তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার বান্দা পাপ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন রব আছে, যিনি পাপ মার্জনা করেন এবং পাপের কারণে ধরেন। এ কথা বলার পর সে আবার পাপ করল এবং বলল, হে আমার রব! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও। তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার এক বান্দা পাপ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন রব আছে যিনি পাপ মার্জনা করেন এবং পাপের কারণে শাস্তি দিতে পারেন। তারপর সে পুনরায় পাপ করে বলল, হে আমার রব! আমার পাপ মাফ করে দাও। এ কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বলেন, আমার বান্দা পাপ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন প্রভু আছে, যিনি বান্দার পাপ মার্জনা করেন এবং পাপের কারণে পাকড়াও করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে বান্দা! এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল

করো। আমি তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছি। বর্ণনাকারী আবদুল আ'লা বলেন, "এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল করো" কথাটি আল্লাহ তা'আলা তৃতীয়বারের পর বলেছেন, না চতুর্থবারের পর বলেছেন, তা আমি জানি না।'[২১৩][২১৪]

তৃতীয়ত হল গোপনে দান।

'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তাও উত্তম, আর যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং তা অভাবগ্রস্তদেরকে দান কর, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম, অধিকন্তু তিনি তোমাদের কিছু গুনাহ মোচন করে দেবেন, বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা করছ, আল্লাহ তার খবর রাখেন।'[২১৫]

'যারা নিজেদের মাল রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ব্যয় করে থাকে, তাদের জন্য সেই দানের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।'[২১৬]

নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না।[২১৭]

যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না [র] আবু হোরায়রা [রা] থেকে বর্ণিত ,রাসুল [সা] বলেন,সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তার আরশের ছায়াতলে জায়গা দেবেন,যেদিন তার ছায়া ব্যতিত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।
১। ন্যায় পরায়ণ ইমাম[রাষ্ট্র নায়ক] ২। ঐ যুবক যা আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে। ৩।ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত ৪। ঐ দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে,মিলিত হয় এ প্রেরণা নিয়ে এবং পৃথক হয় এ প্রেরণা সহ ৫। ঐ ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত সুন্দরি মহিলা [অসৎ কাজে] আহ্বান করে, আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬। ঐ ব্যক্তি ,যে কিছু দান করল এবং এমন ভাবে করল যে তার ডান হাত জানতে পারল না তার বাম হাত কি করেছে ৭। ঐ ব্যক্তি যে একাকি বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দুই চোখে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরে।[২১৮]

চতুর্থত হল আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় নিজেদের সম্পদ ব্যয় করা।

'যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ব্যয় ক'রে নিজেদের দানের কথা মনে করিয়ে দেয় না আর (দান গ্রহীতাকে) কষ্ট দেয় না, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট নির্ধারিত আছে, তাদের কোন ভয় নেই, মর্মপীড়াও নেই।'[২১৯]

'যারা আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ব্যয় করে, তাদের (দানের) তুলনা সেই বীজের মত, যাথেকে সাতটি শীষ জন্মিল, প্রত্যেক শীষে একশত করে দানা এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন, বর্ধিত হারে দিয়ে থাকেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, জ্ঞানময়।'[২২০]

কুরআন ও হাদিসের আলোকে তাওবা ও ইস্তেগফার দুয়াসমূহ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين

[১] হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।[২২১]

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

[২]'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন'।[২২২]

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

[৩] হে আমার প্রতিপালক! আপনি ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে, আর জালিমদের শুধু ধবংসই বৃদ্ধি করুন।[২২৩]

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

[৪]হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান করুন এবং সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আমাকে মিলিয়ে দিন (৮৩) আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী (বিখ্যাত) করুন। এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন! এবং আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না পুনরুত্থান দিবসে।[২২৪]

رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَۃً لِّلَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا وَ اغۡفِرۡ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

[৫] হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র করবেন না, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন! আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২২৫]

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

[৬] হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আমাদের অপরাধ ও আমাদের অপচয়সমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের চরণসমূহ সুদৃঢ় করুন এবং অবিশ্বাসীদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।[২২৬]

رَّبِّ اغۡفِرۡ وَ ارۡحَمۡ وَ اَنۡتَ خَیۡرُ الرّٰحِمِیۡنَ

[৭] হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমিই তো সর্বশ্রে 'দয়ালু। [২২৭]

بَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

[৮] হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা।[২২৮]

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

[৯] হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করনা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের যেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ

করেছিলে আমাদের উপর তেমন গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করনা। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর।[২২৯]

-رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

[১০] হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘন প্রবণ করো না এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা দাও, নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।[২৩০]

-رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا)৬৫(إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

[১১] হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, এর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ) নিশ্চয় উহা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসাবে নিকৃষ্ট।

-رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

[১২] হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকিদের জন্য অনুসরণযোগ্য।[২৩১]

-رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

[১৩] হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।[২৩২]

-رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[১৪] হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[২৩৩]

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

[১৫] হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব হতে রক্ষা কর।[২৩৪]

-رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

[১৬] হে আমার প্রতিপালক! এ-নগরীকে নিরাপদ কর এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে দূরে রাখ।[২৩৫]

-رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

[১৭] হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না।[২৩৬]

-حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

[১৮] আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট,তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।[২৩৭]

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَاۤ اِنۡ نَّسِیۡنَاۤ اَوۡ اَخۡطَاۡنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحۡمِلۡ عَلَیۡنَاۤ اِصۡرًا کَمَا حَمَلۡتَهٗ عَلَی الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَۃَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعۡفُ عَنَّا ٝ وَ اغۡفِرۡ لَنَا ٝ وَ ارۡحَمۡنَا ٝ اَنۡتَ مَوۡلٰىنَا فَانۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

[১৯] হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন

এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।‘ [২৩৮]

رَبِّ هَبۡ لِیۡ حُکۡمًا وَّ اَلۡحِقۡنِیۡ بِالصّٰلِحِیۡنَ ﴿۸۳﴾ وَ اجۡعَلۡ لِّیۡ لِسَانَ صِدۡقٍ فِی الۡاٰخِرِیۡنَ ﴿۸۴﴾وَ اجۡعَلۡنِیۡ مِنۡ وَّرَثَۃِ جَنَّۃِ النَّعِیۡمِ ﴿۸۵﴾ وَ اغۡفِرۡ لِاَبِیۡۤ اِنَّہٗ کَانَ مِنَ الضَّآلِّیۡنَ ﴿۸۶﴾ وَ لَا تُخۡزِنِیۡ یَوۡمَ یُبۡعَثُوۡنَ ﴿۸۷﴾

[২০] ‘হে আমার রব, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করে দিন’। ‘এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার সুনাম-সুখ্যাতি অব্যাহত রাখুন’, ‘আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল’। ‘আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয় সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল’। আর যেদিন পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না’।[২৩৯]

খাঁটি তাওবার শর্তাবলি ও পদ্ধতি

আমরা দুনিয়াতে চলতে ফিরতে সকল বিষয় সকল জিনিসের জন্য সবসময় উত্তমটাই নির্বাচন করে থাকি।খাবার থেকে শুরু করে যেকোনো জিনিস ই আমরা সবসময় উত্তম আর খাঁটি টাই বেছে নেই।যেহেতু আমরা দুনিয়াবি বিষয়ে সবসময় ভাল ,উত্তম ,খাঁটি জিনিসটাই পছন্দ করে থাকি ঠিক একই ভাবে আমাদের জন্য উচিত মুমিন হয়ে আখিরাতের ক্ষেত্রেও উত্তম জিনিস্টাই বেছে নেয়া।কারন দুনিয়া ক্ষণস্থায়ি, আমাদের আসল ঠিকানা ,আসল বাসস্থান পরকালে জান্নাত ।

আর সেটা যদি হয় তাওবার ক্ষেত্রে ,তবে কতই না উত্তম, কতই না সৌভাগ্যবান এর বিষয়। তাওবা আমরা অনেকেই করে থাকি তবে আমরা অনেকেই খাঁটি তাওবা কিভাবে করে তা জানি না,যার জন্য আদৌ আমাদের তাওবা কবুল হচ্ছে কি না আমাদের জানা নেই,তাই এবার আমরা জানবো কিভাবে তাওবা করলে আল্লাহ তায়ালা তা পছন্দ করেন এবং তা কিভাবে করলে আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন,

তাওবাহ্ খাঁটি হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সে শর্তসমূহ পূরণ না করে তাওবাহ্ করলে সে তাওবাহ্ খাঁটি তাওবাহ্ হবে না আর তা আল্লাহর নিকট কবূলও হবে না। শর্তাবলীর সংখ্যা সর্বনিমণ ৩টি আর সর্বোচ্চ ৬টি। যদি গুনাহের সম্পর্ক শুধু আল্লাহর (অবাধ্যতার) সঙ্গে

থাকে এবং কোন মানুষের অধিকারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এ ধরনের তাওবাহ্ ক্ববূলের জন্য ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) ও সাউদী আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতী শাইখ ‘আবদুল ‘আযীয বিন ‘আবদুল্লাহ বিন বায (রহিমাহুল্লাহ) সহ অনেক আলিমের মতে শর্ত ৩টি। তবে কোন গুনাহ যদি মানুষের অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তাহলে আরও একটি শর্ত বেড়ে তা হয়ে যাবে ৪টি।নিম্নে আমরা সেই শর্তগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ।

প্রথম শর্ত

তাওবাহ্ একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে এবং আল্লাহর কাছে করতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত

যে গুনাহের জন্য তাওবা করা হচ্ছে সে গুনাহের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া ।

তৃতীয় শর্ত

যে গুনাহ হতে তাওবাহ্ করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে।

চতুর্থ শর্ত

ভবিষ্যতে এই গুনাহ আর না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে ।

পঞ্চম শর্ত

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাওবাহ্ করতে হবে ।

ষষ্ঠ শর্ত

গুনাহটি যদি মানুষের অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত থাকে তবে মানুষের অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

১. তাওবাহ্ একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে এবং আল্লাহর কাছে করতে হবে :

কেউ যদি গুনাহ করে আল্লাহর অবাধ্যতা করে ,আল্লাহর কাছে খাস অন্তর থেকে তাওবা না করে ,লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ,লোকে ভাল বললে,সুনাম খ্যাত হওয়ার জন্য তাওবা করে থাকে তবে সে তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন না। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নিয়তে বা অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে তাওবা করলে তা কবুল করা হবে না।

কেননা আমি যার অবাধ্যতা করেছি তার কাছে তার সন্তুষ্টির জন্য যদি তাওবা না করে থাকি তা কি করে গ্রহণ যোগ্য হবে।

তাওবাহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য হতে হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকাল এবং গুনাহ থেকে মুক্তি। এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে তাওবাহ্ করা যাবে না। বরং অন্য কোন উদ্দেশে তাওবাহ্ করলে গুনাহ মাফ তো হবেই না উল্টো নতুন গুনাহ ‘আমলনামায় যোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টানদের পাদ্রী কিংবা মুসলিমদের পীর-দরবেশ, বুজুর্গ-মাশায়েখ, হিন্দুদের ব্রাহ্মণ-ঠাকুর-পুরোহিতের কাছে তাওবাহ্ করার কোন সুযোগ নেই। তাওবাহ্ মানে তাদের পড়ানো কোন গদ নয়। তারা কেউই ব্যক্তির পাপ মোচন করতে পারে না। আল্লাহ দুনিয়ার কাউকে এমন ক্ষমতা দেননি।

২. গুনাহের কাজ করার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে :

গুনাহ করার পর তা থেকে তাওবাহ্ করতে চাইলে তাওবাকারীকে অবশ্যই তার কৃতকর্মের জন্য অন্তর থেকে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে। অপরাধকর্মের কারণে লজ্জিত হওয়া খাঁটি তাওবার শর্ত। নবি (সা.) বলেছেন :

“অনুতপ্ত হওয়াই হল তাওবার মূল বিষয়।”[২৪০]

এছাড়াও রাসুল [স] বলেছেন,

“আমার প্রত্যেক উম্মাতের পাপ মাফ করে দেয়া হবে, তবে যে প্রকাশ্যে পাপ করে (অথবা পাপ করে বলে বেড়ায়) তার পাপ মাফ করা হবে না। আর পাপ প্রকাশ করার এক ধরন এও যে, একজন লোক রাত্রে কোন পাপ করে ফেলে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করে নেন। (অর্থাৎ কেউ তা জানতে পারে না।) কিন্তু সকাল বেলায় উঠে সে লোকের কাছে বলে বেড়ায়, ‘হে অমুক! গত রাতে আমি এই এই (পাপ) কাজ করেছি।’ রাতের বেলায় আল্লাহ তার

পাপকে গোপন রেখে দেন; কিন্তু সে সকাল বেলায় আল্লাহর সে গোপনীয়তাকে নিজে নিজেই ফাঁস করে ফেলে।''[২৪১]

৩. যে গুনাহ হতে তাওবাহ্ করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে;

আমরা যে গুনাহ থেকে তাওবা করব সেই গুনাহ থেকে পরিপূর্ণ ভাবে ফিরে আসতে হবে,তাওবা করার আগে। একজন সত্যিকারের তাওবাকারী এমনটাই করবে,কেননা তার মধ্যে সেই গুনাহের উপর ঘৃণা জন্মায়,তাই যদি তাওবাকারী সত্যি অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করতে চায় তবে তিনি অবশ্যই সেই গুনাহ থেকে পূর্ণ রূপে ফিরে আসার চেষ্টা করবে।

আবার একইভাবে হারাম কোন কাজ করে ফেলার গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করতে চাইলে সবার আগে খুব দ্রুত সেই হারাম কাজটি করা বর্জন করতে হবে। তারপর তাওবাহ্ করতে হবে। যেমন কেউ যদি সুদের পাপ থেকে তাওবাহ্ করতে চায় তাহলে তাকে সবার আগে সুদ গ্রহণ বন্ধ করতে হবে এবং তা থেকে দূরে সরে যেতে হবে। আর সুদের যে অর্থ-সম্পদ তার কাছে আছে তা হিসাব করে হালাল অর্থ থেকে পৃথক করে সাওয়াবের উদ্দেশ্য ছাড়া সমাজকল্যাণমূলক কাছে ব্যয় করতে হবে। কেউ তাওবাহ্ করতে চায় অথচ ফরয 'ইবাদাত বর্জন করেই যাচ্ছে বা হারাম কাজ করেই যাচ্ছে তাহলে তার তাওবাহ্ কখনোই কবূল হবে না। বরং তার তাওবাহ্ হয়ে যাবে আল্লাহর সাথে ঠাট্টা করার শামিল। ময়লা থেকে পা ধুয়ে সেই পা কোন ময়লাহীন শুকনো স্থানে রাখতে হবে। নয়তো ময়লায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পা ধুলে অথবা ধোয়া পা ময়লাতেই রাখলে পা ধোয়া নিরর্থক হবে।

৪. ভবিষ্যতে এই গুনাহ আর না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে :

খাঁটি তাওবাহ্ করার জন্য কৃত গুনাহর জন্য লজ্জিত হয়ে গুনাহ বর্জন করলেই হবে না। ভবিষ্যতে আর এই গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। যদি তাওবাহ্ করার সময় মনে মনে নিয়ত থাকে যে সুযোগ পেলে আবার ঐ গুনাহর কাজ করবো তাহলে সেই তাওবার কোন গুরুত্ব আল্লাহর কাছে নেই। সেই তাওবাহ্ কোন তাওবাই নয়।

তবে কখনো কখনো পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও যদি আবার তা করে ফেলে, তাহলে বলা যাবে না যে, পাপীর আগের তাওবাহ্ কবূল হয়নি, তা বাতিল হয়ে গেছে। কারও আগের তাওবাহ্ কবূল হওয়ার পরও সে আবার পাপে লিপ্ত হতে পারে। তখন সে আবার তাওবাহ্ করবে। ভবিষ্যতে পাপ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও যদি অনিচ্ছা সত্ত্বে বারবার সে পাপে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে সে বারবারই তাওবাহ্ করবে।

তবে মনে রাখতে হবে পাপী ব্যক্তি কোন অবস্থায় সেই পাপে লিপ্ত হয়েছে তা কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন। তাই আল্লাহকে ফাঁকি দিয়ে তাওবাহ্ করা যায় না। সাধারণভাবে কেউ যদি অনিচ্ছকৃত বা না জেনে গুনাহ করে আল্লাহর কাছে মাফ চায়, আবার গুনাহ করে মাফ চায় আল্লাহ ক্ষমা করবেন। সে কথাই নাবী (সা.) হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করেন। তিনি (সা.) বলেন :

"কোন বান্দা একটি পাপ করে বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার বান্দা একটি পাপ করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন।' অতঃপর সে আবার পাপ করল এবং বলল, 'হে আমার রব! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার বান্দা একটি পাপ করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন।' আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সুতরাং সে যা ইচ্ছা করুক।"[২৪২]

"আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুল্ম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তারা তার পুনরাবৃত্তি করে না।"[২৪৩]

"তোমরা দয়া কর, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। তোমরা ক্ষমা কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা কথা শুনেও শুনে না। দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা জেনে শুনে তাদের কৃত অপরাধের উপর অটল থাকে।"[২৪৪]

৫. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাওবাহ্ করতে হবে :

তাওবাহ্ করার নির্ধারিত সময় আছে। আর তাওবার নির্ধারিত সময় দুই ধরনের :

এক. প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাওবার সর্বশেষ সময় হচ্ছে তার মৃত্যু। তাই মৃত্যু আসার আগেই তাওবাহ্ করতে হবে।

দুই. সকল মানুষের জন্য তাওবাহ্ করার সর্বশেষ সময় হচ্ছে ক্বিয়ামাতের আলামত হিসেবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। তাই সাধারণভাবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার আগেই তাওবাহ্ করতে হবে।

মূলত পাপ করার পরক্ষণেই তাওবাহ্ করা উচিত। অনেকে শেষ জীবনে দাড়ি-চুল পাকলে পরে তাওবাহ্ করবেন বলে অপেক্ষায় থাকে, অবহেলা করে। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু এসে যাওয়ায় সে আর তাওবার সুযোগ পায় না।

মহান আল্লাহ বলেছেন :

''নিশ্চয় তাদের তাওবাহ্ কবূল করা আল্লাহর দায়িত্ব যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে। তারপর অনতিবিলম্বে তারা তাওবাহ্ করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবাহ্ কবূল করবেন আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতিপ্রজ্ঞাময়। আর তাওবাহ্ নেই তাদের, যারা অন্যায় কাজসমূহ করতে থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায়, তখন বলে, আমি এখন তাওবাহ্ করলাম; আর তাওবাহ্ তাদের জন্য নয়, যারা কাফির অবস্থায় মারা যায়; আমরা এদের জন্যই তৈরী করেছি যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব।''[২৪৫]

আর নাবী (সা.) বলেছেন :

''নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবাহ্ সে পর্যন্ত কবূল করবেন, যে পর্যন্ত তার প্রাণ কণ্ঠাগত না হয় (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ঘ্যার ঘ্যার করা শুরু করে)।''[২৪৬]

মহান আল্লাহর 'আযাব দেখার পরে করা তাওবাও কোন উপকারে আসবে না। মৃত্যুর সময় ফির'আওনের ঈমান তার কোন উপকার করেনি। সুতরাং কেউ আল্লাহর 'আযাব গ্রাস করার মুহূর্তে তাওবাহ্ করলে তা তার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

''তারপর তারা যখন আমার 'আযাব দেখল তখন বলল, 'আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, আর যাদেরকে আমরা তার সাথে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম'। সুতরাং তারা যখন আমার 'আযাব দেখল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকার করল না। এটা আল্লাহর বিধান, তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে। আর তখনই ঐ ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।''[২৪৭]

একইভাবে ক্বিয়ামাতের পূর্বে তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যখন কেউ তাওবাহ্ করতে চাইলেও তখন তার তাওবাহ্ প্রতিপালকের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন :

''তারা কি এরই অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট ফেরেশতাগণ হাযির হবেন, কিংবা তোমার রব উপস্থিত হবেন অথবা তোমার রব-এর আয়াতসমূহের কিছু সংখ্যক আয়াত প্রকাশ পাবে?

যেদিন তোমার রবের আয়াতসমূহের কিছু সংখ্যক আয়াত প্রকাশ পাবে, সেদিন কোন ব্যক্তিরই তার ঈমান উপকারে আসবে না যে পূর্বে ঈমান আনেনি, কিংবা সে তার ঈমানের মাধ্যমে কোন কল্যাণ অর্জন করেনি। বল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমরাও অপেক্ষা করছি'।"[২৪৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

"তাওবার সুযোগ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। আর পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত তাওবার সুযোগ কেটে যায় না।"[২৪৯]

অন্যত্র নাবী (সা.) বলেছেন :

"যে ব্যক্তি পশ্চিম দিকে থেকে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে তাওবাহ্ করবে, আল্লাহ তার তাওবাহ্ গ্রহণ করবেন।"[২৫০]

তাই মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার বা পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করতে হবে। আগামীকাল নয়, আজই এখনই তাওবাহ্ করতে হবে।

৬. মানুষের অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে :

গুনাহটি যদি মানুষের অধিকার বা এর সাথে সম্পর্ক থাকে যথা কারো জিনিসের বা কথার খিয়ানত,কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত প্রদান করা,অন্যায়ভাবে মিথ্যারোপ করা ,এক্ষেত্রে তাকে সেই ব্যক্তি অর্থাৎ যার সাথে অন্যায় করেছে তার কাছে গিয়ে মাফ চাওয়া ,তার যে জিনিস এর খেয়ানত হয়েছে সেই জিনিস ফিরিয়ে দেয়া।কেননা রাসুল[সা] বলেছেন,

"যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সম্ভ্রম বা অন্য কিছুতে কোন যুলুম ও অন্যায় করে থাকে, তাহলে সেদিন আসার পূর্বেই সে যেন আজই তার নিকট হতে (ক্ষমা চাওয়া অথবা প্রতিশোধ/পরিশোধ দেয়ার মাধ্যমে) নিজেকে মুক্ত করে নেয়; যে দিন (ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য) না দীনার হবে না দিরহাম, টাকা-পয়সা, মাল-ধন (সেদিন) যালেমের নেক 'আমল থাকলে তার যুল্ম অনুপাতে নেকী তার নিকট থেকে কেটে নিয়ে (মাযলুমকে দেয়া) হবে। পক্ষান্তরে যদি যদি তার নেকি না থাকে (অথবা নিঃশেষ হয়ে যায়) তাহলে তার বাদীর (মাযলূমের) গুনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে।"[২৫১]

আর কেউ যদি কোন বান্দার হক নষ্ট করে কিন্তু যার হক নষ্ট করেছে শত চেষ্টা করেও তাওবাহ্ করার সময় তাকে খুঁজে না পায় বা তার কাছে পৌঁছতে না পারে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা গুনাহকারীকে মাফ করবেন। ইন-শা-আল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর হক নষ্ট করার গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করার জন্য প্রথম ৫টি শর্ত যথেষ্ট। তবে আল্লাহর হকের মধ্যে কিছু হক আছে যা তাওবার মাধ্যমে মাফ হয় না সেগুলো কাযা আদায় করে হক পূরণ করতে হয়। যেমন, সলাত, সিয়াম ইত্যাদি।[২৫২]

কাফের ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহন

দুনিয়ার জীবনে চলতে ফিরতে আমাদের একে অপরের সঙ্গ প্রয়োজন হয়।হতে পারে তা ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে বা অন্য যেকোনো দুনিয়াবি ক্ষেত্রে।আর মানুষ কখনোই একাকী জীবনযাপন করতে পারে না।জীবনের সকল কিছুর জন্যই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মিলিত ভাবে থাকার ফিতরাত দিয়েছেন,যার দ্বরূন আমরা আমাদের আশে পাশে কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকতে চাই। সে অনুযায়ী আমরা আমাদের পছন্দসই ব্যক্তিদের নিজেদের জন্য বন্ধু বা জীবন সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। তবে এই বন্ধু গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের রব আমাদের জন্য সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন,যাতে করে দুনিয়ার এইসব বন্ধু যেন আমাদের আখিরাতের কষ্টের বা শাস্তির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।যেহেতু আমরা আল্লাহ তায়ালার বান্দা আমরা যেহেতু তার প্রতি টি দিক নির্দেশনা মানার চেষ্টা করে থাকি সে প্রকল্পে এখন আমরা আমাদের এই দিকটি নিয়েও কুরআন হাদিসের আলোকে আলোচোনা করব ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।'[২৫৩]

'হে মুমিনগণ, তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের দীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্য থেকে তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে ও কাফিরদেরকে। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।'[২৫৪]

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত হয়েছেন। তারা তো আখিরাত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেমনিভাবে কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে।[২৫৫]

আল্লাহ তায়ালা এখানে মুসলিম শব্দ ব্যবহার করেন নি বরং তিনি মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলছেন তারা যেন মুমিন ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহন না করেন।কেন্না আখিরাতে আমাদের সফলতায় বাঁধা দেবার জন্য একজন কাফের ব্যক্তি ই যথেষ্ট ।এর কারন সরূপ আল্লাহ তায়ালা এর পরের বাক্যে বলেছেন,'

'কারণ তারা তোমাদেরকে নষ্ট করতে ক্রটি করবে না, তারা কেবল তোমাদের দুর্ভোগ কামনা করে, বস্তুতঃ তাদের মুখেও শত্রুতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রাখে

তা আরও ভয়ঙ্কর, আমি তোমাদের কাছে তাদের লক্ষণগুলো স্পষ্ট করে দিলাম, যদি তোমরা অনুধাবন কর।‘[২৫৬]

এর পরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের আরো কিছু গোপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন।আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘শোন, তোমরাই তো তাদেরকে ভালবাস এবং তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না।‘[২৫৭]

‘যদি তোমাদের কল্যাণ হয়, তা তাদেরকে দুঃখ দেয়, আর যদি তোমাদের অকল্যাণ হয়, তাতে তারা আনন্দিত হয়,’[২৫৮]

বন্ধুর দ্বারা সহজেই অসৎ পথে চলে যাওয়া সম্ভব। একজন বন্ধুই পারে তার অপরবন্ধুকে খারপ থেকে ভাল, ভাল থেকে খারাপের দিকে নিয়ে আসতে,তবে বর্তমানে ভাল থেকে খারাপের প্রভাব সবথেকে বেশি,তাই বন্ধু নির্বাচনে আল্লাহর রাসুল[সা] বলেছেন,

“মানুষ তার একান্ত বন্ধুর ধর্মই গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন একটু ভেবে দেখে যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে যাচ্ছে”।[২৫৯]

তবুও কেউ যদি ইচ্ছাকৃত আল্লাহর বিধান অমান্য করে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে থাকে তবে তার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এই আয়াত,যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

‘মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন।‘[২৬০]

‘হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।‘[২৬১]

তবে এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বন্ধুর ব্যাপার এ বলেন

‘বন্ধুরা সেদিন হয়ে যাবে একজন আরেকজনের দুশমন, তবে মুত্তাকীরা ছাড়া।[২৬২]

কেননা মুত্তাকিদের বন্ধু একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ,

‘তারা আল্লাহর মুকাবিলায় তোমার কোন কাজে আসবে না। আর নিশ্চয় যালিমরা মূলত একে অপরের বন্ধু এবং আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।‘[২৬৩]

তাই যদি আমরা কোন উত্তম বন্ধুর খোজ না পাই তবে খারাপ সঙ্গ থেকে একাকী থাকা অনেক গুন ভাল। কেননা একাকী থাকাতে গুনাহ কম করা হয় ,এক প্রকার গুনাহ করাই হয় না,তবে যখন কোন অসৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে আমরা যাই, কোন না কোন ভাবে আমরা গুনাহে জড়িত হই।অনেকসময় এসব সঙ্গ এর কারনে আমাদের কাছে গুনাহ করা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে,গুনাহ ছেড়ে দেয়াটা যেন জীবন ত্যাগের থেকেও কষ্টদায়ক হয়ে পরে।তাই আমাদের উচিত উত্তম মানুষদের সংস্পর্শে থাকা,হোক তা প্রতিবেশি,স্কুল বন্ধু বা অফিসের কলিগ। যতটুকু সম্ভব খারাপ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত।

বর্তমান সময়ের কিছু কুফরি কালাম ও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

বর্তমান সময়ে মুসলমানদের অনেকেই আছেন যারা নিজের অজান্তেই কুফরি করে বসছে। অহংকার বসত , হিংসা-বিদ্বেষের বশবরতিহয়ে অনেকেই কুফরি তথা যাদুটোনা করছে। অনেকেই আছে যারা অন্যদের ভাল হওয়া ,ভাল কিছু অর্জন করা,পারিবারিক ভাল সম্পর্ক ,বা অন্য যেকোনো ভাল কিছু তারা মেনে নিতে পারে না নিজেদের অহংকার বশত, অনেকে নিজেদেরকে শুধরিয়ে ভাল চিন্তার প্রসার ঘটান তবে অনেকের মধ্যে এই হিংসা অহংকার ভয়ানক রূপ ধারন করে ,যার কারনে তারা কুফরি তথা শায়তানের আশ্রয় নেয়,যার দ্বারা তিনি অন্যের ক্ষতি করতে আগ্রহী হোন। যা এখনকার সময়ে অহরহ ঘটেই চলেছে,স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো, বিয়ে না হওয়ার জন্য যাদু, টাকার হিংসায় অন্য ব্যক্তির আর্থিক সমস্যার জন্য যাদু,ইত্যাদি আরো অনেক কিছু রয়েছে য্র জন্য মানুষ যাদুটোনা করে যাচ্ছে। এর আবির্ভাব ঘটে সুলাইমান [আ] সময় থেকে,যা আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি,

“তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র; কাজেই তুমি কুফুরী করো না। তা সত্ত্বেও তারা ফিরিশতাদ্বয়ের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। অথচ তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্বারা কারো অনিষ্ট করতে পারত না। এতদসত্ত্বেও তারা তা-ই শিখত যা তাদের ক্ষতি করত এবং কোনো

উপকারে আসতো না। তারা ভালোভাবে জানে যে, যে কেউ তা খরিদ করে (অর্থাৎ জাদুর আশ্রয় নেয়) তার জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত![২৬৪]

তবে তিনি জানেন না যে তিনি তার নিজের হিংসা অহংকারের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর সাথে কুফরি করে যাচ্ছেন ,আল্লাহর অবাধ্যতা করে যাচ্ছেন এবং যার জন্য তার কোনো আমল আল্লাহর নিকট কবুল কৃত হবে না,

ইমরান ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট কিছুর ভিত্তিতে কোনো কিছু অশুভ বলে ঘোষণা দেয় কিংবা যার জন্য (তার চাওয়া অনুসারে) অশুভ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়; যে ব্যক্তি গণনা করে কিংবা যার জন্য (তার চাওয়া অনুসারে) গণনা করা হয়; যে ব্যক্তি জাদু করে কিংবা যার জন্য (তার চাওয়া অনুসারে) জাদু করা হয়, তাদের কেউই আমাদের অন্তর্গত নয়। আর যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে এসে তার বক্তব্যকে সত্য মনে করে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ সত্যকে অস্বীকার করল"।

হাদীসটি বাযযার উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

তবে এসব যাদুর ক্ষতি থেকে বাচার জন্য আল্লাহর রাসুল [সা] আমাদের কিছু উপায় শিখেয়েছেন,যা দ্বারা কেউ আমাদের কার উপর যাদু করলেও আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তার মধ্যে থাকার দ্বারা তার [যাদু] ক্ষতি থেকে বেঁচে যাওয়া সম্ভব হবে ইন শা আল্লাহ,তবে মনে রাখতে হবে যেকোনো কল্যাণ ,অকল্যাণ আল্লাহ তায়ালার হাতে,তার হুকুমেই আমাদের কল্যান এবং অকল্যাণ নিহিত,তাই কোন ব্যক্তি চাইলেই আমাদের ক্ষতি করতে পারে না ,পারবে না।কেননা হাদিস এ এসেছে ,

'জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন বান্দাহই মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে তাকদীর ও তার ভাল-মন্দের উপর ঈমান আনবে। এমনকি তার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতে হবে যে, যা কিছু ঘটেছে তা কিছুতেই অঘটিত থাকত না এবং যা কিছু ঘটে নাই তা কখনোও তাকে স্পর্শ করবে না।'[২৬৫]

তাহলে অনেকের মনেই প্রশ্ন আসবে তাহলে আমরা কেন যাদুর ক্ষতি থেকে বাচতে বা অন্য যেকোনো কিছুর ক্ষতি থেকে বাচতে এর থেকে পরিত্রাণের দুয়া পাঠ করব?এর জবাব ও আমরা আল্লাহর রাসুল[স] এর হাদিস থেকে পেয়ে থাকি,

'সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু'আ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারে না এবং সৎকাজ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই হায়াত বাড়াতে পারে না।'[২৬৬]

ইবন আবূ উমার (রহঃ) ..... আবূ খিযামা তার পিতা ইয়ামুর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লা! এই যে ঝাড়-ফুঁক আমরা করি, ঔষধাদি দিয়ে আমরা চিকিৎসা করি, এবং বিভিন্ন প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করে থাকি এই গুলি কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে রদ করতে পারে? তিনি বললেনঃ এইগুলিও আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।[২৬৭]

এবার কিছু উপায় নিয়ে আলোচনা করব যা বিভিন্ন হাদিস এবং কুরআন থেকে আমরা জানতে পারব ইন শা আল্লাহ

যাদু টোনা এসব এখনকার সময়ে প্রতিনিয়তে ঘটেই চলেছে,আমাদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ আছে যারা অন্যদের খারাপ অবস্থায় পতিত করার জন্য ,নিজেদের জেদ হিংসা মিটানোর জন্য যাদু তথা শয়তানের পূজারি হয়ে যায়।যাদুর আক্রমণ থেকে বাচার জন্য আল্লাহর রাসুল আমাদেরকে ১৪০০ বছর আগেই এর অনিষ্টতা থেকে মুক্তির পথ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন, যা আমরা বিভিন্ন হাদিস এর মাধ্যমে জানতে পারব ইন শা আল্লাহ।

১। আজওয়া খেজুর।

আজওয়া খেজুর এর অনেক উপকারিতা রয়েছে এর মধ্যে একটি হল,কেউ যদি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে সাতটি আজওয়া খেজুর খালি পেটে খায় তবে ,সেই ব্যক্তি সারা দিন আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকবে ,এমনকি বিষ পান করলেও এর প্রক্রিয়া তাকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

ইসহাক ইবন মাসুর[র] সা'দ [রা] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসুল[সা] কে বলতে শুনেছি,যে ব্যক্তি ভোর বেলা সাতটি আজওয়া খেজুর খাবেসে দিন বিষ বা যাদু তার কোন ক্ষতি করবে না।[২৬৮]

‘আবূ উবায়দা ইবন আবূ সাফার ও মাহমূদ ইবন গায়লান (রহঃ) .... আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আজওয়া হলো জান্নাতী খেজুর। এতে আছে বিষের প্রতিষেধক, মাসরুম হলো মান্নের অন্তর্ভুক্ত। এর পানি হলো চক্ষু রোগের প্রতিষেধক।‘[২৬৯]

২। মধু পান করা।

‘আবূ উবায়দা ইবন আবূ সাফার ও মাহমূদ ইবন গায়লান (রহঃ) .... আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আজওয়া হলো জান্নাতী খেজুর। এতে আছে বিষের প্রতিষেধক, মাসরুম হলো মান্নের অন্তর্ভুক্ত। এর পানি হলো চক্ষু রোগের প্রতিষেধক।‘[২৭০]

৩।সুরা নাস ও সুরা ফালাক।

ইবরাহিম ইবন মুসা[র] আয়েশা [রা] থেকে বর্ণিত ,রাসুল[স] সে রোগের কারনে ইন্তেকাল করেন,সেই রোগের সময় তিনি নিজ দেহে [মু’আব্বিযাত] সুরা নাস ও ফালাক পড়ে ফুক দিতেন।এরপর যখন রোগ তীব্র হল তখন আমি পড়ে ফুক দিতাম।আর আমি তার নিজের হাত তার দেহের উপর বুলিয়ে দিতাম।কেননা তার হাতে বরকত ছিল।রাবি বলেন,আমি যুহরিকে জিজ্ঞাসা করলাম,তিনি কিভাবে ফুক দিতেন?তিনি বললেন,তিনি তার দুই হাতের উপর ফুক দিতেন,এরপ্র সেই হাতদ্বয় দ্বারা আপন মুখমণ্ডল বুলিয়ে দিতেন।[২৭১]

৪। সুরা ফাতেহা পাঠ করা।

‘মুহাম্মাদ ইবন বাশশার [র] আবু সাইদ খুদরি[রা] থেকে বর্ণিত ,রাসুল[সা] এর সাহাবিদের মধ্যে কতিপয় সাহাবি আরবের এক গোত্রের নিকট আসলেন।গোত্রের লোকেরা তাদের কোন মেহমানদারি করল না।তারা সেখানে থাকা কালে হঠাত সেই গোত্রের নেতাকে সর্প দংশন করল।তারা তখন এসে বলল আপনাদের কাছে কি কোন ঔষধ আছেঅথবা আপনাদের মধ্যে ঝাড় ফুকারি কোন লোক আছে কি? তারা উত্তর দিলেন,হ্যা।তবে তোমরা আমাদের কোন মেহমানদারি কর নি।কাজেই আমাদের জন্য কোন বিনিময় নির্ধারণ না করা পর্যন্ত আমরা তা করব না।ফলে তারা তাদের জন্য এক পাল বকরি বিনিময় স্বরূপ দিতে রাজি হলে।তখন এক সাহাবি উম্মুল কুরআন [সুরা ফাতিহা] পড়তে লাগলেন এবং মুখে থুথু জমা করে তা ঐ ব্যক্তির গায়ে ছিটিয়ে দিলেন।ফলে সে আরোগ্য লাভ করল।এরপর তারা বকরিগুলো নিয়ে

এসে বলল ,আমরা নবিজি [স] জিজ্ঞাসা করার পুরবে এগুলো স্পর্শ করব না।এরপর তারা রাসুল[সা] কে জিজ্ঞাসা করলেন।রাসুল[সা] শুনে হেসে দিলেন এবং বললেন,তোমরা কি করে জানলে যে এটা রোগ নিরাময় কারি?ঠিক আছে বকরিগুলো নিয়ে যাও এবং তাতে আমার জন্যও এক অংশ রেখো।‘[২৭২]

৫।

" أَذْهِبِ الْبَاسْ رَبَّ النَّاسْ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا " .

[বুখারি শরিফ হাদিস নং ৫৩৩২][২৭৩]

৬।সুরা বাকারা পাঠ করা।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদের ঘরবাড়িগুলো (আমলশূন্য রেখে) কবরে পরিণত কোরো না। অবশ্যই যে বাড়িতে সুরা বাকারা পাঠ করা হয়, সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে।’ [২৭৪]

৭। আয়াতুল কুরসি পাঠ করা।

আয়াতুল কুরসির ব্যাপারে নবীজি বলেন, ‘তুমি যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন আয়াতুল কুরসি পড়বে।তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না।’[২৭৫]

মুহমামদ ইবন বাশশার [র] আবু আইয়্যুব আনসারি[রা] থেকে বর্ণিত ,তার একটি তাক ছিল তাতে তিনি কিছু শুকনো খেজুর রাখতেন কিন্তু শয়তান জিন এসে রাতে তা নিয়ে যেত। তিনি নবি [স] এর কাছে এসে এ বিষয়ে অভিযোগ জানালেন।তিনি বললেন, যাও এটিকে যখন দেখবে তখন বলবে বিসমিল্লাহ, আল্লাহর রাসুল[সা] তোমাকে ডেকেছেন,চল।

রাবি বলে, আবু আইয়্যুব[রা] তাকে পাকড়াও করলেন,এটি তখন কসম করল যে সে আর করবে না।ফলে এটিকে ছেড়ে দিলেন।অনন্তর নবি [স] এর কাছে এলেন,তিনি বললেন,তোমার বন্দী কি করল?

আবু আইয়্যুব [রা] বললেন, কসম করে বলল ,পুনর্বার আর করবে না।তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে আরা তার অভ্যাস ই হল মিথ্যা বলা।

রাবি বলেন আবু আইয়্যুব [রা] আবার সেটিকে পাকড়াও করলেন আবার সে কসম করল যে সে আর পুনর্বার করবে না, আবার তিনি সেটিকে ছেড়ে দিলেন।অনন্তর নবি[স] এর কাছে এলেন, তিনি বললেন, তোমার বন্দী কি কর্ম করল?

আবু আইয়্যুব[রা] বললেন, সে কসম করেছে সে আর করবে না।তিনি বললেন ,সে মিথ্যা বলেছে,তার অভ্যাস ই হল মিথ্যা বলা।

আবু আইয়্যুব [রা] তাকে আবার পাকড়াও করলেন এবং বললেন এবার তোমাকে নিবি[সা] এর কাছে না নিয়ে আর ছাড়ব না।সে বলল আমি আপনাকে একটি বিষোয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি,।তা হল আপনার ঘরে আয়াতুল কুরসি পরবেন।তাহলে আপনার কাছে শয়তান ও অনিষ্টকার কিছু আসতে পারবে না।অনন্তর তিনি নাবি[সা] এর কাছে গেলেন ,তিনি বললেন, তোমার বন্দী কি কর্ম করল? আবু আইয়্যুব [রা] তাকে পুরো ঘটনা বললেন।রাউল[সা] বললেন, এবার সে সত্য বলেছে,যদিও সে মিথ্যাবাদী।[২৭৬]

ইমান মজবুতকরণের কিছু মাধ্যম

যার ইমান যত বেশি মজবুত হবে তা তার জন্য দুনিয়াতে বিভিন্ন পরিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে যেমন সহজতর হবে তেমনই আখিরাতের পথে উন্নিত হওয়ার পথ ততটাঈ সফলকাম হবে, তার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে থাকবে সাহায্য।আর তাই আমাদের জানা উচিত কিভাবে আমরা আমাদের ইমানকে আরো বেশি মজবুত করতে পারি, এবং তা কিভাবে ,কী কী উপায়ে আমরা করতে পারি।

১। গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কুরআন তিলওয়াত করা।

আল-কুরআনের- আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্বলিত -আয়াত সমূহ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা, নবী- রাসূল ও তাদের উম্মতদের মহান মহান কাহিনী সম্বলিত আয়াত সমূহ মনযোগ দিয়ে পাঠ করা। কারণ, তাতে আমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছেঃ

‘তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।[২৭৭]

'আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?'[২৭৮]

'আর আমি একে বানিয়েছি দৃষ্টান্ত, সে সময়ের এবং তৎপরবর্তী জনপদসমূহের জন্য এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।[২৭৯]

'অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৮০]

'তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা, এটা কোন বানানো গল্প নয়, বরং তাদের পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ। আর হিদায়াত ও রহমত ঐ কওমের জন্য যারা ঈমান আনে।'[২৮১]

২।আল্লাহ তায়ালার ফরজ ও ওয়াজীব ইবাদত সমূহের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং নফল ইবাদতের অভ্যাস গড়ে তোলা।

আমাদের রব আমাদের জন্য যেসব বিষয় ফরজ[নামায, রোযা, ,হজ্জ, যাকাত] করেছেন এবং যেগুলোর প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ[দান করা, কুরআন তিলাওয়াত,তাহাজ্জুদ,যিকির] করেছেন।সেসকল ক্ষেত্রে আমাদের অধিক যত্নবান হওয়া দরকার।আমরা যখন এসব বিষয়ে নিজেদেরকে আতস্থ করতে পারব ,তখনি আমাদের দ্বারা অন্যান্য সকল নফল ইবাদাত করাটাও সহজ হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ । এর দ্বারা আমাদের ইমান মজবুত ও শক্ত হবে।

'কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক এবং মুমিনগণ- যারা তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা নাযিল হয়েছে তোমার পূর্বে- তাতে ঈমান আনে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান আনয়নকারী, তাদেরকে অচিরেই আমি মহাপুরস্কার প্রদান করব।[২৮২]

অতঃপর যখন তোমরা সালাত পূর্ণ করবে তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করবে। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে। নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।[২৮৩]

তাদেরকে কেবল এই আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য খালেস রেখে এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে আর এটাই সরল সঠিক উম্মতের দীন।[২৮৪]

তোমরা সলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাতের প্রতি এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দন্ডায়মান হও। [২৮৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা] থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন ,আমি আল্লাহর রাসুল[সা] কে জিজ্ঞাসা করলাম,হে আল্লাহর রাসুল! কোন কাজ সর্বোত্তম? তিনি বললেন,সময় মত সালাত আদায় করা।' আমি বললাম ,'অতঃপর কোনটি?' তিনি বলেন,অতঃপর পিতা মাতার সঙ্গে সদাচরণ করা।' আমি বললাম ,'এরপর কোনটি? তিনি বললেন 'আল্লাহর পথে জিহাদ।' অতঃপর রাসুল[সা] কে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে আমি চুপ রইলাম ।আমি যদি আর বলতাম ,তবে তিনি আরও অধিক বলতেন।[২৮৬]

৩।হাদিস অধ্যায়ন ,রাসুল[স] ও তার সাহাবাদের জীবনী পড়ে সে অনুযায়ী আমলের চেষ্টা

বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।[২৮৭]

আমরা যখন হাদিস,সীরাহ এবং সাহাবী আজমাইনদের জীবনী মনোযোগ সহকারে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলব তখন তার দ্বারা আমরা বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব ইন শা আল্লাহ। যেমন আল্লাহর হাবিব রাসুল [স] এর অধিক মহৎ গুন [ধৈর্য] সম্পর্কিত ঘটনা যখন আমরা অধ্যায়ন করব বা শুনব তখন আমাদের জন্য দুনিয়ার এই সামান্য পরিক্ষা ,বিপদ আপদ কষ্টকর মনে হবে না। সাহাবা,উম্মুল মু'মিনদের মুসলমান হবার ঘটনা আমাদের মধ্যে ইমানী আলোড়ন সৃষ্টি করবে,কিভাবে তারা আল্লাহ তায়ালার দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করে গিয়েছেন নিজেদের পরিবার পরিজন কে অমান্য করে তারা ধনীমুখী জীবন ছেড়ে সামান্য টাকার জীবন বেঁচে নিয়েছিলেন।

তাদের উত্তম গুনাবলি সম্পর্কে যখন আমরা ইল্ম অর্জন করব ,তখন আমাদের উচিত সেইসব গুনাবলি নিজেদের মধ্যেও আতস্থ করার।তবেই আমরা হাদিস ও তাদের জীবনী পড়ে সৌভাগ্য লাগ করতে পারব ইন শা আল্লাহ।

৪।সর্বাবস্থায় মনোযোগ সহকারে আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন থাকা

সর্বদা যিকিরে তথা আল্লাহ তায়ালার স্মরনে নিমজ্জিত থাকায় মুমিন বান্দার অন্তরে আল্লাহ তায়ালা নূর প্রদান করেন।যার দরূন তাঁর অন্তর হয়ে উঠে সজীব ও সুস্থতায় ভরপূর।কেননা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার স্মরনই পারে আমাদের অন্তরের অসুস্থতাকে দূর করতে এবং ইমান বৃদ্ধি করতে।

‘কাজেই তুমি ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল- সন্ধ্যায় তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ কর।‘[২৮৮]

‘যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়’।[২৮৯]

সাহল ইবনু সাদ [রা] থেকে বর্ণিত, নবি[সা] বলেন, আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার ভিতরের সকল কিছু থেকে উত্তম।‘[২৯০]

‘আর তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিমগ্ন হও।[২৯১]

‘মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।[২৯২]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন, আমি বান্দার ধারণা অনুযায়ী নিকটে আছি। যখন সে আমার যিকির (স্মরণ) করে সে সময় আমি তার সাথে থাকি। বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করলে আমিও তাকে এককী স্মরন করি। আর যদি সে আমাকে কোন সভায় আমার কথা স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সভায় স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়িয়ে আসি। (ই.ফা. ৬৫৬১, ই.সে. ৬৬১৫) (সহিহ মুসলিম ৬৬৯৮)

৫।সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত নিয়ে চিন্তা ফিকির করা এবং তার শুকরিয়া আদায় করা

'তিনিই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কান, চোখ ও অন্তর; তোমরা কৃতজ্ঞতা অল্পই করে থাক।'[২৯৩]

'আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি বানিয়েছেন যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পার, আর দিনকে করেছেন আলোকময়। আল্লাহ মানুষদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের পরও) কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।'[২৯৪]

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেল। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।[২৯৫]

নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য বহু নির্দশন।[২৯৬]

৬।আল্লাহ ওয়ালা অর্থাৎ নেক বান্দাদের সোহবতে থাকা।

আমরা যখন নেক বান্দাদের সহবত তথা তাদের অধীনে থাকব তখন আমাদের মধ্যে নিজেদের কৃত গুনাহের জন্য নিজেদের অন্তরে অনুকম্পা তৈরি হবে, ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ জাগবে,আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের[স] প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পাবে,আর যখন আল্লাহ ও রাসুল[স] এর প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পাবে তখন আমাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুল [স] এর দেয়া বিধি নিষেধ মানা অনেক সহজ হয়ে যাবে,আর এরই মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ইমানী জজবা তৈরি হবে।তাই যথাসম্ভব নেক বান্দা ,উত্তম লোকদের নিকটে থাকার চেষ্টা করা উচিত।

৭।এমন সকল বিষয় বা উপকরন থেকে বিরত থাকা যা আল্লাহ ও তার বান্দার সম্পর্কের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

আল্লাহ তাঁর বান্দার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও তা অটুট রাখার যেমন বিভিন্ন উপায় আল্লাহ এবং আমাদের রাসুল [স] শিখিয়ে দিয়েছেন,তেমনি ভাবে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা আমাদের সাথে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে সহায়তা করে।যেমন,শিরক,কুফরি,বিদাআত,আল্লাহর দেয়া বিধি নিষেধের উপেক্ষা করা ইত্যাদি আরো এমন অনেক কিছু রয়েছে যা থেকে আমাদের নিজেদের কে হাফেজতে রাখার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দুয়া করা,আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

৮। নিজের মধ্যকার খারাপ বিষয় গুলোকে সংশোধন করা।

আমরা আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা ,এর মানে এই নয় যে আমাদের দ্বারা কোনো গুনাহ সংঘঠিত হবে না বা হয় নি,আমাদের মধ্যে কোন খারাপ অভ্যাস নেই,এসব তো শুধু ফেরেস্তাদের বৈশিষ্ট। তবে আমাদের গুনাহ হওয়া স্বাভাবিক,তবে অনবরত গুনাহ করেও তাওবা না করাটাই বড় অপরাধ।তাই নিজেদের মধ্যে খারাপ যেসব অভ্যাস রয়েছে সেসব সংশোধনের চেষ্টা করা ।তবেই আমরা আল্লাহ তায়ালার অধিক নিকটবর্তী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব ইন শা আল্লাহ।

‘সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে।[২৯৭]

‘আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।[২৯৮]

৯। সকল ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

‘আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়।‘[২৯৯]

‘তোমরা যদি সেসব কবীরা গুনাহ পরিহার কর, যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাব সম্মানজনক প্রবেশস্থলে।[৩০০]

১০। আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্বকে উপলব্ধি করা।তার সৃষ্টি নিয়ে ফিকির করা।

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি নিয়ে ফিকির করাটাও এক ইবাদত।আমরা যখন আল্লাহ তায়ালার সকল বিষয় নিয়ে চিন্তা ফিকির করব তখন তা আমাদের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করবে।আমরা

আল্লাহ তায়ালার প্রদান করা নিয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতে সচেষ্ট হব।আর যখন আমরা আল্লাহ তায়ালার দেয়া নিয়ামত স্মরণ করব তখন আমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার জন্য অন্তরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে।আর তখন আল্লাহ তায়ালার সাথে বান্দার সম্পর্ক আরো দৃঢ় ও মজবুত হবে ।তাই আমাদের উচিত আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের কথা স্মরণ করা এবং শুকরিয়া আদায় করা।

'রাত ও দিনের আবর্তনে, আর আল্লাহ আকাশ থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর আবার জীবিত করেন আর বায়ুর পরিবর্তনে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'[৩০১]

'আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে, তার সবই তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। চিন্তাশীল কওমের জন্য নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে।'[৩০২]

১১। সবসময় যেই অবস্থাতেই থাকি না কেন মৃত্যুকে স্মরণ করা।

(সুন্নাহ ও আদব ঠিক রেখে) বেশি বেশি কবর যেয়ারত করা কারণ, এতে দিল নরম হয় এবং মৃত্যুর স্বরণ'কে বাড়িয়ে দেয়।

রাসূল (সঃ) বলেনঃ আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে কবর যেয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এখন তোমারা কবর যেয়ারত কর কেননা, কবর যেয়ারতে মৃত্যুর স্বরণ রয়েছে।[৩০৩]

এবং প্রতিনিয়ত "মুহাসাবা" (আত্মসমালচনা) তথা নিজের হিসেব নিকেশ করা যে, "আমি কি আমল করলাম"? "মৃত্যুর জন্য কেমন প্রস্তুতি নিলাম"আখেরাতের জন্য কি প্রেরণ করলাম ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অনুবাদঃ মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।[৩০৪] যেমন হযরত উমর (রঃ) বলেনঃ

অর্থাৎ "আল্লাহ তোমার হিসাব নেয়ার পূর্বেই নিজের হিসাব নাও"।

“মুহাসাবা” এর বহু উপকারীতা রয়েছে; যথা- নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হয় এবং হায়াত শেষ হওয়ার পূর্বে পূর্বেই প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়, যথাযথ আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়, পরিশেষে মৃত্যুর আগে আগে তওবা করার সুযোগ পাওয়া যায়, অতএব মুহাসাবা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল।

১২। জিহাব ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে আযাব দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তরসমূহকে চিন্তামুক্ত করবেন।[৩০৫]

কিন্তু রাসূল ও তার সাথে মুমিনরা তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে, আর সে সব লোকের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম।[৩০৬][৩০৭]

‘আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ। তাদের জন্য আছে তাদের প্রতিদান ও তাদের নূর।‘[৩০৮]

আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম।[৩০৯]

১৩। আল্লাহ তায়ালার কাছে নিজের অন্তর কে দীনের উপর অটল রাখার জন্য দুয়া করা।

আমাদের মধ্যে যারা জন্ম গত ভাবে দ্বীনের বুঝে বড় হয়েছি তা আল্লাহ তায়ালার এক অশেষ রহমত ও নিয়ামত।তবে আমরা যারা জীবনের অনেক বছর পেরিয়ে আল্লাহ তায়ালার মহব্বতে তাঁর দ্বীনে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছি ,এই নেয়ামতের অনুভূতি শুধু তারাই বুঝবে যারা আল্লাহ তায়ালাকে অনুভব করতে শিখেছি ,পেয়েছি অনেকটা বছর পেরিয়ে।কিন্তু এই নেয়ামত অর্থাৎ হেদায়াত স্থায়ী নয়,যদি না আমরা তাঁর কদর না করে থাকি।দুয়া করা নিজের রবের কাছে যেন তিনি আমাদের এই হেদায়াতের উপর অটল রাখেন এবং এর উপর আল্লাহ তায়ালার কাছে স্বরণাপোন্ন হবার তৌফিক দান করেন।

১৪। আল ওয়ালা ওয়াল বারা ঠিক রাখা।

আল ওয়ালা ওয়াল বারা (বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা) এটি একটি হারানো আকিদা, এই আকিদাটি'র কথা মুসলমানরা প্রায় ভূলেই গেছে, তাই তাদের আজ এই দুরবস্থা,

অতএব এটার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি অর্থাৎ মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা চাই সে পৃথিবীর যে কোনো স্থানেই বসবাস করুক না কেন, আর কুফরের সাথে বিদ্বেষ রাখা কারণ, দ্বীনের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখলে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে এমনকি একসময় ঈমান হারা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

' মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।[৩১০]

তিনি আরো বলেনঃ

' তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মুমিনগণ-যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। [৩১১]

রাসূল (সঃ) বলেনঃ যে কেউ আল্লাহ তা'আলার (সন্তুষ্টি) জন্য কাউকে ভালোবাসো এবং আল্লাহ তালার জন্যই কাউকে ঘৃণা করলো এবং আল্লাহর জন্যই কাউকে কিছু দান করে আবার আল্লাহর জন্যই কাউকে দান করা হতে বিরত থাকে -সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করেছে। [৩১২]

ইমান আনার পর অব্যাহত ভাবে কুফরিকারীর তাওবা

আমরা অনেকেই আছি যারা ক্রমাগত কুফরি করার পর আল্লাহর দয়ায় রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ পেয়েছি এবং কুফরি বিষয়ক সকল কিছু থেকে নিজ ও নিজ পরিবারকে এসব থেকে সতর্ক থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছি।তবে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা অব্যাহত ভাবে কুফরি করেই যাচ্ছেন,এমনকি তাওবা করেও অনেকে কুফরি থেকে সাবধান থাকছেন না ,ক্রমাগত করেই যাচ্ছেন ,জাহান্নামের পথে হেটেই চলছেন।নিজের অজান্তেই অনেকেই ক্রমাগত কুফরির পথে হেটেই চলেছেন।এভাবেই কুফরির মধ্যে থেকেই তাওবা করছেন ,কিন্তু তার তাওবা কবুল করা হচ্ছে না,কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে ঈমান আনার পর, তারপর তারা কুফরীতে বেড়ে গিয়েছে, তাদের তাওবা কখনো কবুল করা হবে না। আর তারাই পথভ্রষ্ট।'[৩১৩]

'যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।[৩১৪]

শুধু কুফরি নয় যেকোনো মন্দ কাজ যদি কেউ ক্রমাগত করতেই থাকে বং অনুতপ্ত না হয় তার কৃত গুনাহের জন্য তার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'আর তাওবা নাই তাদের, যারা অন্যায় কাজ করতে থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায়, তখন বলে, আমি এখন তাওবা করলাম, আর তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা কাফির অবস্থায় মারা যায়; আমি এদের জন্যই তৈরী করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।[৩১৫]

'তার কারণ এই যে, তারা ঈমান আনে, অতঃপর কুফুরী করে। এজন্য তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। যার ফলে তারা কিছুই বুঝে না [৩১৬]

তাই যথা সম্ভব আখিরাতে সফল হওয়ার জন্য শিরক ও কুফরি বিষয়ক সকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।কি কি ক্ষেত্রে কুফরি হয় ,এসব বিষয় জানতে আমাদের ইলম অর্জনের পথে চলতে হবে ,নয়ত আমাদের অজান্তেই কুফরি হয়ে যাবে এবং এর কারনে আমরা চিরদিনের জন্য হয়ে যাব জাহান্নামের অধিবাসী।

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভে করনীয় ও বর্জনীয়

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার জীবনের শুরু যেমন আছে ঠিক এর শেষও আছে।তবে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে সফলতা অর্জন করাটা অনেকটাই সহজ,যদি না আমরা আল্লাহ তায়ালার দেয়া আদেশ উপদেশ মানি। এই ছোট্ট জীবনে ভাল কিছু অর্জন করা ,ভাল পর্যায়ে অবস্থান করতে আমরা প্রত্যেকেই চাই।তবে কখনো কখনো আমরা ভাল থাকার ভাল পাবার লোভে পড়ে গিয়ে আল্লাহ তায়ালার নাফরমানিতে লিপ্ত হই,কেননা মানুষের ফিতরাত ই হচ্ছে সে ভাল কিছু পাবার ,ভাল কিছু অর্জনের জন্য যেকোন কিছু করতে পারি,যেকোন পথ অবলম্বন করতে সচেষ্ট হয়। তবে আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনেকে প্রাধান্য দেয়া কখনোই মুমিনের বৈশিষ্ট হতে পারে না।অধিক পার্থিব আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল[স] বলেছেন,

আবান বিন উসমান, থেকে বর্ণিত:

''যায়দ বিন সাবিত (রাঃ) দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট থেকে বের হয়ে এলে আমি ভাবলাম, নিশ্চয় কোন গুরত্বপূর্ণ বিষয় জানার জন্য এ সময় তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আমাদের শ্রুত কতক হাদীস শোনার জন্য মারওআন আমাদের ডেকেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন, দরিদ্রতা তার নিত্যসংগী হবে এবং পার্থিব স্বার্থ ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তকদীরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখেরাত, আল্লাহ তার সবকিছু সুষ্ঠু করে দিবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করবেন এবং দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাযির হবে।‘‘[৩১৭]

যারা শুধু পার্থিব জীবনের আশা করেন তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আয়াত বর্ণনা করেন,

‘যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না।‘[৩১৮]

'যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে অধিক পছন্দ করে, আর আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতার সন্ধান করে; তারা ঘোরতর ভ্রষ্টতায় রয়েছে।'[৩১৯]

'যে দুনিয়া চায় আমি সেখানে তাকে দ্রুত দিয়ে দেই, যা আমি চাই, যার জন্য চাই। তারপর তার জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম, সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত, বিতাড়িত অবস্থায়।[৩২০]

তবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য তার আদেশ নিদেশ পালনে অনেক সহজ করে দিয়েছেন যা অর্জনে আমরা উত্তম জিনিস এর পাশাপাশি অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে,ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

''হে মুমিনগণ,তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।[৩২১]

''যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত। তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবী জীবনে এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসফলতা।[৩২২]

''নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।[৩২৩]

সর্বপ্রথম আমাদের কে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান এনে তাকওয়া অবলম্বন তথা আল্লাহকে ভয় করা উচিত।যদি আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে থাকি তা অন্তরে লালন করি,তবেই আমাদের জন্য সাফল্য অর্জন এর পথে হাটা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে,কেননা যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে থাকে,তার তাকওয়া তাকে যেকোনো খারাপ কাজ করার আগে অধিক বার চিন্তা করার এবং তা তাকে যেকোন খারাপ কাজ ,আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি করা থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

''তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান কে? নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে সবচেয়ে আল্লাহ্‌ভীরু, সে-ই অধিক সম্মানিত। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা এ ধরনের কথা জিজ্ঞেস করিনি। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে আল্লাহ্‌র নবী ইউসূফ ('আ)।[৩২৪]

''সেই জান্নাত, আমি যার উত্তরাধিকারী বানাব আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যারা মুত্তাকী।[৩২৫]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর বল, 'তোমরা আমল কর। অতএব, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যা তোমরা আমল করতে সে সম্পর্কে'।'[৩২৬]

এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূকারী, সিজ্দাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।'[৩২৭]

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য কিছু গুণ বর্ণনা করেছেন,যেগুল আয়ত্ত্ব করার দ্বারা আমরাও সফলতা অর্জন করতে পারি এবং আলাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।

প্রথমত আল্লাহ তায়ালা বলেছেন তারা তাওবাকারী,আমরা অনেকেই আছি যারা প্রতি নিয়ত গুনাহের দিকে ধাবিত হচ্ছি,কোন অনুতপ্ততা আমাদের মধ্যে কাজ করে না,আবার অনেকে আছি বার বার গুনাহে জরিয়ে বার বার আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবা করতে আমাদের অন্তর লজ্জিত হয়,আমরা আল্লাহ তায়ালার সামনে নিজেদের কৃত গুনাহ নিয়ে তাওবা করতে অনুতপ্ত ও লজ্জিত বোধ করে থাকি,কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তিনি তার বান্দার তাওবা কে ভালবাসেন,যে বান্দা যত গুনাহ ই করুক না কেন যদি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে ফিরে আসে তবে আল্লাহ তায়ালা ঠিক তাকে ক্ষমা করে দিবেন , তাকে রহমতের চাঁদর দ্বারা আচ্ছাদিত করে নিবেন নিজের কাছে,তা আমরা এক হাদিসের আলোকে জানতে পারি,

'উমারাহ্ ইবনু 'উমায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিত:

''তিনি বলেন, আমি হারিস ইবনু সুওয়াইদকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ আমার কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এবং অপরটি তার নিজের তরফ থেকে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ তাঁর মু’মিন বান্দার তাওবার কারণে বেশি খুশী হন। জারীর-এর হাদীসের অবিকল। [৩২৮]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

‘’তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করে তখন আল্লাহ ঐ লোকের চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যে মরুভূমিতে নিজ সওয়ারীর উপর আরোহিত ছিল। তারপর সাওয়ারীটি তার হতে হারিয়ে যায়। আর তার উপর ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। এরপর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় এসে আরাম করে এবং তার উটটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হঠাৎ উটটি তার কাছে এসে দাঁড়ায়। অমনিই সে তার লাগাম ধরে ফেলে। এরপর সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে ভুল করে ফেলেছে।[৩২৯]

ইবাদত কারী,নামায রোযা ,হজ্জ ,যাকাত এগুলো ই শুধু ইবাদত নয়,আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টীর নিয়তে যেকোনো ভাল কাজ ই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।যেমন,একজন নারীর জন্য তার পরিবারের সদস্যদের খেয়াল রাখা,রান্না বান্না করা,ঘরের কাজ এসকল কিছুই যদি হয় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য তবে এগুলো ও ইবাদতের অন্তরভুক্ত হবে।একজন পুরুষ,তার সারা দিনের কাজ কর্ম করা তার পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন,পরিবারের দায়িত্ব গ্রহন,এসকল কিছুই ইবাদতের মধ্যে গণ্য।

আবূ মাস‘উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

‘’রাবী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে? তিনি বললেন, (হ্যাঁ) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ সওয়াবের আশায় কোন মুসলিম যখন তার পরিবার-পরিজনের প্রতি ব্যয় করে, তা তার সদকা হিসাবে গণ্য হয়। [৩১] (মুসলিম ১২/১৪ হাঃ ১০০২, আহমাদ ১৭০৮১) (আ.প্র. ৪৯৫১, ই.ফা. ৪৮৪৭)[৩৩০]

সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করাটা এ সময় অনেকটা চোখে পড়ে না।মানুষ কি ভাববে ,কেউ কষ্ট পাবে ভেবে আমরা কাউকে সৎ কাজের আদেশ দিলেও অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করি না।কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকেই সুসংবাদ প্রদান করেছেন যারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সীমালজ্ঞনকা্রিদের সাথে মিলিত হবার ব্যাপারে নিষেধ প্রদান করেছেন।কেননা সীমালজ্ঞনকারীদের সাথে মিলিত হলে আশংকা থাকে যে একজন মুমিন তিনিও সীমালজ্ঞঙ্কারী যেন না হয়ে যান।কেননা খারাপের প্রভাব একজন ব্যক্তির মধ্যে ভাল এর প্রভাব এর থেকেও অধিক দ্রুত প্রভাবিত হয়।আর আল্লাহ তায়ালা কখনই তার বান্দাদের অকল্যাণ চান না। তিনি চান না যে তাঁর বান্দা সীমালজ্ঞনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করুক এবং আযাব এর সম্মুখীন হোক।তিনি তাঁর বান্দাদের ভালবাসেন,তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য বিভিন্ন উপায় আমাদের জন্য তাঁর রাসুল[স] এর মাধ্যমে আমাদের নিকট প্রদান করেছেন।

‘’আর যারা সীমালজ্ঞন করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; অন্যথায় আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না। অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।[৩৩১]

‘অতঃপর তাদের রব তাদের কাছে ওহি পাঠালেন,’আমি অবশ্যই সীমালজ্ঞঙ্কারীদের ধ্বংস করে দেব।‘[৩৩২]

আল্লাহ তায়ালা এক স্থানে এর পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন যে, কিভাবে আমরা আখিরাতের সফলতা লাভ করতে পারি,

‘যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যারা তা অটুট রাখে এবং তাদের রবকে ভয় করে, আর মন্দ হিসাবের আশঙ্কা করে।যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সবর করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযক প্রদান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভাল কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের শুভ পরিণাম।স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, তাদের স্ত্রীগণ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎ ছিল তারা প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে।‘[৩৩৩]

এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে ওয়াদার কথা বলছেন,তা হল নিজেদের নবি রাসুল এর সাথে কৃত উম্মতের ওয়াদা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের যা আদেশ নিষেধ করেছেন তা পূর্ণ করা ইত্যাদি।

পরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার কথা বলেছেন।এবং তাকওয়া বা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলার কথা উল্লেখ করেছেন।যে আল্লাহ তায়ালাকে যত বেশি ভয় করবে তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল[স] এর প্রতি তত বেশি ভালবাসা জন্মাবে,আর যখন কেউ আল্লাহ ও তার রাসুল[স] কে ভালবাসবেন তখন কোন ধরনের আপত্তি ,দ্বিধাবোধ ছাড়াই আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশ নিষেধ মেনে চলবে, ভালবাসার সাথে সে গুলো অনুসরন করার চেষ্টা করবে।এবং নিজ অন্তর থেকেই মন্দ জিনিসের প্রতি তার ঘৃণা ভাব জন্মাবে।

এরপর ই আল্লাহ তায়ালা সবর তথা ধৈর্য ধারন করার কথা বলেছেন।বিপদে আপদে সবর করাই শুধু সবর নয়,নিজেকে অন্যায় মন্দ কাজ করা থেকে বিরত রাখাও একরকম সবর এর অন্তরভুক্ত।নিজের নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিকর বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করাটাও সবর,সালাতের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা অধিক আয়াত নাযিল করেছেন,এবং এখানেও আল্লাহ তায়ালা আমাদের কে সালাত প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত খুশু খুযুর সাথে আদায় করবে তা তাকে সকল মন্দ খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট খবে।আর তাই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সালাতের ব্যাপারে এত জোরতাগিদ দিয়েছেন।সাথে গোপনে ব্যয় করা একধরনের গুনাহ মাফের উছিলা।আমরা সকলেই কম বেশি দান খয়রাত করেথাকি,তবে যদি গোপনে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা যায় তা আমাদের জীবনে খুব ভাল ও উত্তম প্রভাব ফেলে,যেমন যেকোনো বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ তায়ালা উদ্ধার করেন,রিযিকে বারাকাহ দেন,ইত্যাদি।

অতঃপর যারা এসব বৈশিষ্ট অর্জন করবে তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা পরের আয়াতে সুসংবাদ প্রদান করেছেন।আর তা হল জান্নাত।

বভওজনে কম দেয়া এখন একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে উঠেছে।ওজনে বা মাপে কম না দেয়া ছাড়া যেন ব্যবসায়ই হয় না।মানুষকে ঠকানো যেন নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।কিন্তু আমাদের জানা নেই যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র কুরআনে এই বিষয়টী খুব কঠিন ভাবে নিষেধ করেছেন।

''হে আমার সম্প্রদায়! মাপ ও ওজন ইনসাফের সঙ্গে পূর্ণ করো, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য কম দিও না, আর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।[৩৩৪]

''মাপ দেয়ার সময় মাপ পূর্ণমাত্রায় করবে, আর ওজন করবে ত্রুটিহীন দাঁড়িপাল্লায়। এটাই উত্তম নীতি আর পরিণামেও তা উৎকৃষ্ট।[৩৩৫]

কিছু আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা ,যা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বর্ণনা করেন

সুরা বনি ইসরাইলে আমরা এই সম্পর্কিত অধিক আয়াত পাব যার মধ্যে আমরা এমন সব আদেশ নিষেধ এর ব্যাপারে জানতে পারব যা আল্লাহ তায়ালা তার রাসুলের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌছিয়েছেন। এছাড়াও আমরা কুরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে এই সম্পর্কিত আয়াত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ।

১। পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার।

আল্লাহ তায়ালার বড় সব নেয়ামতের মধ্যে মা-বাবা এক অন্যতম নেয়ামত।আল্লাহ তায়ালা তাদে্র উছিলা করেই আমাদের এই দুনিয়াতে আসার তৌফিক দিয়েছেন,তাদের উছিলাতেই আল্লাহ তায়ালা আ্মাদেরকে মুসলিম হয়ে জন্ম নেবার এবং মুসলিম হয়ে বেড়ে উঠার তৌফিক দিয়েছেন, তাদের উছিলাতেই আমরা আজ আল্লাহ তায়ালাকে জানার ও অনুভব করার মত, তার ভাল বাসা উপলব্ধি করতে পারছি,আলহামদুলিল্লাহ।আর আজ এখনো আমাদের বাবা মা আমাদের সাথে এই দুনিয়াতে আছেন এটাও আল্লাহ তায়ালার এক বড় দান।কেননা আমাদের মধ্যে অনেকের মা- বাবা বা কারো মা বা কারো বাবা নেই,এই না থাকার ব্যথা একমাত্র সেই ভাই বা বোন ই বুঝবেন যিনি তাদের বা তাদের একজন কে দুনিয়াতে হারিয়েছেন।এখন হয়ত তাদের আফসোস করা ছাড়া আরো কিছুই করার নেই,কিন্তু আমাদের যাদের বাবা মা এখনো জীবিত আছেন,আমাদের উচিত আফসোসের সময় আফসোস না করে এখনি সেই আফসোস গুলো মনে করে নিজেদের ভুল শুধরিয়ে নেয়া।আর আল্লাহ তায়ালা বলেন,

''আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'।[৩৩৬]

আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে।[৩৩৭]

উপরের আয়াতের সাথে আমাদের এখনকার সন্তানদের অনেক মিল খুজে পাওয়া যায়।আমরা বেশিরভাগ সময় ই নিজেদের পিতা-মাতার সাথে সময় কাটাই না,নিজেদের ফ্রেন্ডস ,নিজেদের স্কুল কলেজ, ভার্সিটি আমাদের সব কিছু ঠিক ঠাক চলে কিন্তু বাবা মায়ের সাথে কিছু সময় কাটানোর সুযোগ হয়ে উঠে না আমাদের।কিন্তু তারা তাদের জীবনের অধিকাংশ সময়

আমাদের পিছনে ব্যয় করেছেন,আমরা কিভাবে ভাল থাকতে পারি,কোনটা আমাদের জন্য উত্তম সেই ভাবনায় তারা আমাদের জন্য দিনের পর দিন কষ্ট করে গিয়েছেন,আল্লাহর নিকট কাকুতি মিনতি করেছেন।এখনো তারা আমাদের সাফল্যের জন্য দুয়া করে যাচ্ছেন।কিন্তু আমরা এমন হতভাগা সন্তান যে, তাদের জন্য দুয়া করারও যেন সময় আমাদের নেই।আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর হেদায়াত নাযিল করুন আমিন সুম্মা আমিন।

কখনো কখনো যদি মা বাবা কিছু বিষয়ে নিষেধ বা বকা ঝকা করে তবেই আমরা নিজেদের সকল রাগের প্রভাব তাদের উপর প্রদান করে থাকি। কিন্তু আমাদের অধিকাংশের জানা নেই যে যদি আমাদের বাবা মা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হোন তবে আল্লাহ তায়ালাও অসন্তুষ্ট হোন,বাবা মা মাফ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালাও আমাদের মাফ করবেন না।শুধু তাই নয় আল্লাহ তায়ালা তাদের অবাধ্য হওয়াকে হারাম করেছেন ।তাই আমাদের সকলের উচিত বাবা মা এর সাথে উত্তম ব্যবহার করা।

সা'দ ইবনু হাফ্স (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

''তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মা-বাপের নাফরমানী করা, প্রাপকের প্রাপ্য আটক রাখা, যে জিনিস গ্রহণ করা তোমাদের জন্য ঠিক নয় তা তলব করা এবং কন্যা সন্তানকে জীবিত ক্ববর দেয়া। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন গল্প-গুজব করা, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ অপচয় করা।(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৪২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৩৭)[৩৩৮]

তারা আমাদের যেভাবে ধৈর্য সহকারে লালন পালন করেছেন তার ঋণ আমরা তাদের সাথে সারাদিন ভাল ব্যবহার করলেও শোধ করতে পারব না।তাই নিজেদের সকল কিছুর আগে নিজেদের বাবা মা এর খেয়াল রাখা আমাদের জন্য ফরজ,তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা উফ শব্দ টুকু ব্যবহার করতে বারণ করেছেন।তাহলে এই আয়াত দ্বারাও বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ তায়ালা আ্মাদেরকে তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করার কথা বলছেন এবং তা কিরুপ হওয়া উচিত।

আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

''তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র নিকট কোন্ কাজ সব থেকে অধিক পছন্দনীয়? তিনি বললেনঃসময় মত সালাত আদায় করা। ('আবদুল্লাহ) জিজ্ঞেস করলেন: তারপর কোন্টি? তিনি বললেনঃপিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা। 'আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন: তারপর কোন্টি? তিনি বললেনঃআল্লাহ্র

রাস্তায় জিহাদ করা। ‘আবদুল্লাহ বললেনঃনবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলো সম্পর্কে আমাকে বলেছেন। আমি তাঁকে আরও অধিক প্রশ্ন করলে, তিনি আমাকে আরও জানাতেন।[৩৩৯]

(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৩৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৩২)

পিতা মাতাকে বার্ধক্য সময়ে পেয়ে সন্তান হয়ে তাদের সেবা করার দ্বারা আমরা খুব সহজেই জান্নাত অর্জন করতে পারি।কেননা তাদের সন্তুষ্টী হল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন।এক হাদিসে আমরা পাই,

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ নাক ধূলিমলিন হোক, আবারও নাক ধূলিমলিন হোক, আবারও নাক ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ ব্যক্তির, হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে বার্ধক্যাবস্থায় পেল অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। (ই.ফা. ৬২৭৯; ই.সে. ৬৩২৮)

[সহিহ বুখারী হাদিস নং ৬৪০৪]

২। আত্মীয়দের,গরিব ,মিসকিনদের হক আদায় করা ও অপচয় রোধ করা।

‘’আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না।নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।[৩৪০]

আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন। কতটা মারাত্মক গুনাহ হলে আল্লাহ তায়ালা এমন কথা বলতে পারেন।কিন্তু বর্তমান সমাজে আমরা এমন অধিকাংশ লোকদের দেখতে পাই যারা শান্তি,সুখের নামে বিলাসিতা করে যাচ্ছে।কিন্তু সমাজের গরিব মিসকিনদের আমরা ভুলেই যাই।তাদের খাওয়ানো ,তাদের আর্থিক সাহায্য করা আল্লাহ তায়ালার যে এক হুকুম তা আমাদের কাছে এক রকম নফল ইবাদাত বা তাঁর থেকেও কম ।আমাদের মধ্যে এমনো লোক বিদ্যমান আছেন,যারা দান করেন ঠিকই ,কিন্তু তাদের আত্মীয়দের মধ্যে যারা সমস্যায় আছেন আর্থিক ভাবে,তাদেরকে চোখে পড়ে না,তাদের হক আদায় না করে আমরা গরিব খুজতে চাই।

তাই আমাদের উচিত নিজেদের প্রয়োজনের পাশাপাশি আমাদের আশে পাশের আর্থিক ভাবে অসম্বল,মিসকিন,অসহায় দরিদ্রদের পাশে দাড়ানো।নয়ত তাদের হক আদায় করতে না পারলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালাও আমাদের ক্ষমা করবেন না।

৩।সন্তান হত্যা।

একটা সময় ছিল যখন মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়া যেন এক প্রকার অন্যায় ছিল।কেননা মেয়েরা শুধু বাবা মা এর কাছে থেকে তাদেরকে আর্থিক ভাবে কোন সাহায্যতো করতেই পারে না সাথে তাদের বিয়ে দিতে চাইলেও তাদের অধিক সম্পদের জরুরত হত ,সেই পরিপ্রেক্ষিতে তারা মেয়ে সন্তানকে জীবিত কবর দিত।তবে এখন সেই প্রচলন না থাকলেও ,অনেক গরিব ,দরিদ্র পরিবার আছে,যারা রিযিকের ভয়ে সন্তান কে হত্যা করে।সন্তান হত্যা শুধু সন্তান জন্মের পরই করা হয় এমনটা নয় সন্তান মায়ের গর্ভে থাকাকালীন যখন তাঁর মধ্যে রুহ প্রবেশ করানো হয় এই অবস্থায়ও আধুনিক প্রচলিত নাম 'এভোরশন ' করানোর মাধ্যমেও সন্তানকে হত্যা করা হয়ে থাকে,যদিও তা আমাদের কাছে হত্যা মনে না হয়।কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে আমাদের রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তিনি যেমন আমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে আমাদের এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন,ঠিক একই ভাবে আমাদের সন্তানদেরকেও তাদের রিযিক সহকারেই দুনিয়াতে পাঠান।

'দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযক দেই আর তোমাদেরকেও, তাদের হত্যা মহাপাপ।[৩৪১]

আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

''তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! কোন্‌ গুনাহ সব হতে বড়? তিনি বললেনঃ কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ গণ্য করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বললেনঃ তারপরে কোন্‌টি? নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমার সাথে খাবে, এ আশঙ্কায় তোমার সন্তানকে হত্যা করা। তিনি বললেনঃ তারপরে কোন্‌টি? নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করে অবতীর্ণ হলোঃ "আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না"- (সূরা আল-ফুরক্বান ২৫/৬৮)।(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৬৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৬২)[সহিহ বুখারি হাদিস নং ৬০০১]

৪। অন্যায় ,অশ্লীল ও যিনা ব্যভিচার।

যিনা বা ব্যভিচার এই শব্দটির সাথে আমাদের পরিচয় না থাকলেও প্রেম নামক শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত।আমরা মুসলমান হিসেবে সকলেই জানি যিনা করা হারাম কিন্তু আমরা প্রেম করাটাকে একপ্রকার হালাল হিসেবে বিশ্বাস করি।কিন্তু এই প্রেম নামক শব্দটি ই মূলত যিনা ব্যভিচার শব্দ থেকে বাহ্যিকভাবে আলাদা হলেও এর বৈশিষ্ট আর যিনার বৈশিষ্ট ঠিক এক রকম।প্রেম নামক কোনো শব্দ আল্লাহ তায়ালার কুরআনে নেই এবং এটি হালাল ও নয়।আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘’আর যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেও না, তা হচ্ছে অশ্লীল কাজ আর অতি জঘন্য পথ।[৩৪২]

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের যে জায়গায় কোন কিছু করতে নিষেধ করলে সোজা সেই বিষয়টি করতে নিষেধ করেছেন,যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না ।[৩৪৩]

এখানে আল্লাহ তায়ালা এক কথায় বলেছেন যে,আমরা যেন শয়তানের পথ অনুসরণ না করি ,আল্লাহ তায়ালা বলেন নি যে তোমরা শয়তানের কাছেও যেও না।,কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যিনার ব্যাপারে এই কথা উল্লেখ করেছেন, যে তোমরা জিনার কাছেও যেও না।কতটা সতর্ক করেছেন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতের মাধ্যমে এই উম্মতকে ।তিনি আমাদেরকে যিনার কাছেও যেতে বারন করেছেন,কারন যিনা শুধুই যিনা ই নয় বরং এর দ্বারা দুইটা জীবনের পাশাপাশি তাদের দুনিয়া আখিরাত বরবাদ হয়,অবাধ মিলামেশার সাথে হারাম শারীরীক সম্পর্ক হয়ে উঠে,যা একটা সমাজে একজন পুণ্যবতী নারীর পাশাপাশি একজন গায়রত পুরুষের চরিত্রে দাগ লাগে।পরবর্তীতে এর প্রভাব গিয়ে পড়ে অবাধ মেলামেশার দ্বারা সম্পর্কিত সন্তানের জীবনের উপর।যা একটা পরিবারকে নষ্ট করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

৫। অহংকার ত্যাগ করা।

অহংকারকারী কে আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করে থাকেন।অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে খুব মহান মনে করে থাকেন।এমন কি আমরা যারা নতুন নতুন দ্বীনের বুঝ পেয়ে আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ মানার চেষ্টা করতে থাকি তখন শয়তান আমাদের মধ্যে সবথেকে বেশি অহংকার সৃষ্টি করে থাকেন।তখন আমাদের মধ্যে এই প্ররোচনা তৈরি হয় যে,আমরাই অধিক সওয়াব অর্জন করছি এবং অন্যদের তুলনায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের সব থেকে বেশি ভালবাসেন।তবে এমনটা ভাবা চিন্তা করা একদম অনুচিত।এধরনের চিন্তাও অহংকার এর

মধ্যে গণ্য।দুনিয়াতে চলার ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় চিন্তা থাকা উচিত যে,আমাদের সওয়াব অর্জন করা যেন আমাদের কে অহংকারী হিসেবে উপস্থাপন না করে।

''যমীনে গর্বভরে চলাফেরা করো না, তুমি কক্ষনো যমীনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর উচ্চতায় পর্বতের ন্যায় হতেও পারবে না।[৩৪৪]

৬। দান করা ,ইনসাফ ও সদাচার এর পাশাপাশি মন্দ কাজ থেকে নিজে বিরত থাকা ও অন্যকে নিষেধ করা।

''নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।[৩৪৫]

''বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।[৩৪৬]

''আর যারা সঠিক পথে চলে আল্লাহ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেন আর স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার রবের কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিণতি হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।[৩৪৭]

৭।কুরআন তিলাওয়াত

''আর তুমি যখন কুরআন পড় তখন তোমার ও যারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাদের মধ্যে আমি এক অদৃশ্য পর্দা দিয়ে দেই।আর আমি তাদের অন্তরের উপর এক আবরণ দিয়ে দিয়েছি যাতে তারা কুরআন বুঝতে না পারে, আর তাদের কানে সৃষ্টি করেছি বধিরতা। আর যখন তুমি কুরআনে তোমার প্রতিপালকের একত্বের উল্লেখ কর, তখন তারা (সত্য থেকে) পালিয়ে পিছনে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।[৩৪৮]

''সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার সময় হতে রাত্রির গাঢ় অন্ধকার পর্যন্ত নামায প্রতিষ্ঠা কর, আর ফাজরের সলাতে কুরআন পাঠ (করার নীতি অবলম্বন কর), নিশ্চয়ই ফাজরের সলাতের কুরআন পাঠ (ফেরেশতাগণের) সরাসরি সাক্ষ্য হয়।[৩৪৯]

৮। মন্দ ও বাজে কথা পরিহার করা।

পরিবার পরিজন বা যেকোনো বন্ধু বান্ধবের সাথে আমরা হাসি ঠাট্টার ছলে অনেক সময় মন্দ এবং কিছু খারাপ ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে থাকি।এটা কখনোই মুমিনের জন্য কাম্য নয়।একজন মুমিনের মুখ থেকে কখনোই এমন কোন শব্দ বের হবে না যা আসল রুপে খুবই নিকৃষ্ট এবং বাজে।আর মন্দ ও বাজে কথা তো শয়তানের পক্ষ থেকেই আসে।

‘’আর আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন এমন কথা বলে, যা অতি সুন্দর। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের স্পষ্ট শত্রু।[৩৫০]

‘’আর তোমার পবিরার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক। তোমার কাছে আমি রিযক চাই না, আমিই তোমাকে রিযক দিয়ে থাকি, উত্তম পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট।[৩৫১]

৯। তাকওয়া অবলম্বন করা।

‘’’আর আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে তাদের সাফল্যসহ নাজাত দেবেন। কোন অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করবে না। আর তারা চিন্তিতও হবে না।[৩৫২]

‘’এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও।[৩৫৩]

‘’নিশ্চয় উত্তম পাথেয় তাকওয়া। আর হে বিবেক সম্পন্নগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর।[৩৫৪]

‘’ অতঃপর মুত্তাকীদেরকে আমি রক্ষা করব আর যালিমদেরকে তার মধ্যে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।[৩৫৫]

১০।তাসবিহ পাঠ করা অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করা।

‘’আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা তাঁরই মালিকানাধীন, আর যারা তাঁর সন্নিকটে আছে তারা গর্বভরে তাঁর ‘ইবাদাত থেকে বিমুখ হয় না, আর তারা (কক্ষনো তাঁর ‘ইবাদাত করার ব্যাপারে) ক্লান্তিবোধ করে না। তারা দিন-রাত তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, তারা শিথিলতা দেখায় না।[৩৫৬]

১১। বিপদে সবর করা।

''যাদের কাছে আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[৩৫৭]

''এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।[৩৫৮]

উপরের দুটি আয়াতে আমরা খেয়াল করব যে,আল্লাহ তায়ালা বলছেন যারা বিপদে আপদে সবর করে এবং সালাত কায়েম করে, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সালাতের মাধয়মে বিপদ থেকে মুক্তির কথা উল্লেখ করছেন। সালাতের মাধ্যমেই আমরা পারি আমাদের বিপদে সবর করার মত বড় গুন অর্জন করতে এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে,কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।[৩৫৯]

তাই আমাদের সকলের উচিত,বিপদে, দুঃখ দুর্দশায় হতাশ না হয়ে সবর করা এবং সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া ,তবেই আমরা বিপদে শান্তির পথ খুজে পাব এবং বিপদ থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের পরিত্রাণ করবেন উত্তম রূপে।

১২। সৎ কাজ করা ।

আমাদের ধারনা যে শুধু নামায রোযা ,হজ্জ,যাকাত,দান করা এসব ই শুধু ভাল কাজ।একদম তা নয়,বরং যেকোনো ভাল কাজ ই আমরা করি না কেন তা সৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে।হতে পারে তা রাস্তা থেকে এমন জিনিস সরিয়ে ফেলা যাতে কারো হাটা চলায় ব্যঘাত ঘটাতে পারে,বা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া,কারো জন্য দুয়া করা ইত্যাদি।

''সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক।[৩৬০]

''হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে।[৩৬১]

‘’আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করব।[৩৬২]

১৩। আমানতের খিয়ানত না করা এবং ওয়াদা পূর্ণ করা।

‘’আর যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান। আর যারা নিজদের সালাতসমূহ হিফাযত করে। তারাই হল উত্তরাধিকারী। তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে, যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।[৩৬৩][৩৬৪]

১৪। নারীদের পরিপূর্ণ পর্দা অনুসরন করা।

‘আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে।[৩৬৫]

‘যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।[৩৬৬]

যারা আমাদের জন্য মাহরাম তারা কারা এবং তাদের সাথেও পর্দা কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ও আল্লাহ তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

‘আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৩৬৭]

বর্তমান সময়ে ফরয বিষয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত হচ্ছে পর্দা। পর্দার ব্যপারে আমরা এতটাই গাফেল হয়ে গিয়েছি যে এখন পর্দা করাটা আমাদের কাছে সাজ গোজের মত, মন

চাইলো তো করলাম নয়ত নয়।এমনকি এই বিষয়টা আমাদের নিকট খুব স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে।কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি পর্দা করাটাও আল্লাহর ফরয বিধানের মধ্যে এক ।আমাদের সমাজে পর্দা বলতে শুধু ঘরের বাইরে বের হলে একটা বোরকা পড়াটাকেই মনে করে থাকি।কিন্তু এমনটা নয় ,শুধু বোরকা পড়াই পর্দার মূল অংশ নয়,বোরকা পড়া পর্দার এক অংশ যদি তা পরিপূর্ণ সাদাসিধে বোরকা হয় তবেই,সাথে গায়রে মাহরামের সাথে অকারনে কথা না বলা,কথা বলা জরুরত হলে কোমল কণ্ঠে না বলা আরো অনেক কিছু ।এমনকি বৃদ্ধ নারীদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

‘’আর বৃদ্ধা নারীরা, যারা বিয়ের প্রত্যাশা করে না, তাদের জন্য কোন দোষ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের কিছু পোশাক খুলে রাখে এবং এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।[৩৬৮]

আমাদের সমাজে যদি পর্দার কথা বলা হয় তবে তারা শুধু নারীদের কেই উদ্দেশ্য করে থাকে, অর্থাৎ তাদের ধারণামতে পর্দা আল্লাহ তায়ালা শুধু নারীদের জন্যই খাস করে আদেশ করেছেন।কিন্তু এমনটি একদম ভুল।পুরুষদের জন্যও আল্লাহ তায়ালা পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন।আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুল [স] কে বলেছেন,

‘মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।‘[৩৬৯]

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন যাতে তারা নিজেদের চোখকে অন্য গায়রে মাহরাম নারীদের দিকে না তাকাতে দেয়,এবং নিজেদের যৌবনের আকাঙ্ক্ষা যেন অন্য গায়রে নারীদের মাধ্যমে পূরণ না করে।

১৫। লজ্জাস্থান হেফাজত।

‘’নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।[৩৭০]

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এক সঙ্গে কিছু বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন।মুসলিম পুরুষ ও নারী থেকে শুরু করে মুমিন,দানশীল,আল্লাহর অনুগত,সত্যবাদী সকল গুনের অধিকারী নারী ও পুরুষ উভয়কে মহাপুরষ্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছেন ।

শুধু তাই নয়,এমনকি নিজের যৌবন ও লজ্জাস্থান হিফাজতকারীদের কথাও আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন।যা বর্তমান সময়ের উঠতি বয়সি এবং যৌবনে পদার্পণকারী ছেলে মেয়েদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট খুব কমই লক্ষ্য করা যায়।

১৬। জিহাদ একটি ফরজ বিধান।

''তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।[৩৭১]

''অতঃপর তাদের উপর যখন লড়াই ফরয করা হল, তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করতে লাগল আল্লাহকে ভয় করার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে কঠিন ভয়। আর বলল, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদের উপর লড়াই ফরয করলেন কেন? আমাদেরকে কেন আরো কিছুকালের অবকাশ দিলেন না'? বল, 'দুনিয়ার সুখ সামান্য। আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাত উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সূতা পরিমাণ যুলমও করা হবে না'।[৩৭২]

''অতঃপর তাদের উপর যখন লড়াই ফরয করা হল, তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করতে লাগল আল্লাহকে ভয় করার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে কঠিন ভয়। আর বলল, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদের উপর লড়াই ফরয করলেন কেন? আমাদেরকে কেন আরো কিছুকালের অবকাশ দিলেন না'? বল, 'দুনিয়ার সুখ সামান্য। আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাত উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সূতা পরিমাণ যুলমও করা হবে না'।[৩৭৩]

মুমিনদের গুনাবলি ও বৈশিষ্ট

১। ইমান আনা।

''গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা ইয়াকীন রাখে।তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।[৩৭৪]

২। মুমিনরা কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন করে না।

''মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন।[৩৭৫]

৩।সালাত আদায়কারী ।

''যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক।[৩৭৬]

৪।অন্যায় কাজের নিষেধ এবং ভাল কাজের উপদেশ প্রদান করা।

''আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৩৭৭]

''তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূকারী, সিজ্দাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।[৩৭৮]

৫। আল্লাহ তায়ালা যাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে নিষেধ করেছেন তা ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকা।

''যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যারা তা অটুট রাখে এবং তাদের রবকে ভয় করে, আর মন্দ হিসাবের আশঙ্কা করে। যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সবর করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিয্ক প্রদান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভাল কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের শুভ পরিণাম। স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, তাদের স্ত্রীগণ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎ ছিল তারা প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে।[৩৭৯]

৬। ইবাদতের সময় অন্তরে নুর তৈরি এবং অন্তর প্রকম্পিত হওয়া।

''নিশ্চয় যারা তাদের রবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহে ঈমান আনে। আর যারা তাদের রবের সাথে শিরক করে না, আর যারা যা দান করে তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে করে থাকে এজন্য যে, তারা তাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। তারাই কল্যাণসমূহের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এবং তাতে তারা অগ্রগামী।[৩৮০]

''যাদের কাছে আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[৩৮১]

৭। অহংকার ত্যাগ করা এবং অপচয় না করা।

''আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'। আর যারা তাদের রবের জন্য সিজদারত ও দন্ডায়মান হয়ে রাত্রি যাপন করে। আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় এর আযাব হল অবিচ্ছিন্ন'। আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে।[৩৮২]

৮। শিরক ও ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা।

‘’আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যে নাফসকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে আযাবপ্রাপ্ত হবে।কিয়ামতের দিন তার আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ী হবে। তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩৮৩]

৯।তাওবাকারী বান্দায় পরিণত হওয়া। অনর্থক কাজ ,কথা পরিত্যাগ করা।

‘’আর যে তাওবা করে এবং সৎকাজ করে তবে নিশ্চয় সে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর যারা মিথ্যার সাক্ষ্য হয় না এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়।আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরদের মত পড়ে থাকে না। আর যারা বলে, ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন’। তারাই, যাদেরকে [জান্নাতে] সুউচ্চ কক্ষ প্রতিদান হিসাবে দেয়া হবে যেহেতু তারা সবর করেছিল সেজন্য। আর তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম দ্বারা।[৩৮৪]

১০। জিহাদের ময়দানে লড়াই করা।

‘’সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার।[৩৮৫]

‘’যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।[৩৮৬]

পরিশিষ্ট কিছু আলোচনা ও নাসিহাত

আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমত ও নেয়ামতে পরিপূর্ণ আমাদের এই জীবন, আর আল্লাহ তায়ালা এত বান্দাদের মধ্যে শুধু মাত্র আমাদেরকে এর জন্য নির্বাচন করেছেন ,আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের রব আমাদের কতটা ভালবাসেন বলে তিনি আমাদেরকে এত বিশৃঙ্খল দুনিয়ার মধ্যেও কতটা সুন্দর – সু শৃঙ্খল জীবন যাপন করার ও তা হালাল ভাবে উপভোগ করার তৌফিক দান করেছেন।শুধু তাই নয় একজন মুমিন হিসেবে তিনি আমাদেরকে একটি পরিবার ও একটি সমাজ গঠন করার তৌফিক দান করেছেন।

আমাদের রব আমাদের এত নেয়ামতে ভরপুর এই জীবন দান করার পরও আমাদের মধ্যে অনেক অকৃতজ্ঞ বান্দা রয়েছে,যারা প্রতিনিয়ত আল্লাহ তায়ালার অমান্য ,অবাধ্যতায় লিপ্ত রয়েছে।তাদের অধিকাংশদের মধ্যে আমাদের মুসলিম ভাই বোনদের এসব অবাধ্যতায় লিপ্ত হতে বেশি দেখা যায়।আর এসব অবাধ্যতার ও গুনাহে লিপ্ত হবার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা বা ইলমে নাফে অর্জনে অবহেলা করা।

একজন মুমিনের জন্য আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল[স] যেসব বিষয় করতে, বলতে আদেশ ও নিষেধ করেছেন সেসকল বিষয় গুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য কোন বিষয় এ কড়া নিষেধ প্রদান করেছেন,কোনগুলো আমাদের জন্য হালাল ইত্যাদি এসব জানা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।আর এসব জ্ঞানের অভাবেই দেখা যায় আমাদের মধ্যে অনেক মুসলিম ভাই বোনেরা আল্লাহ তায়ালার অবাধতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন,যেমন শিরক ও কুফরি কাজে লিপ্ত হওয়া।

আমরা সকলেই জানি আল্লাহ তায়ালা শিরক ও কুফরি ব্যতিত যেকোনো গুনাহ তাওবা ব্যতিতও ক্ষমা করে থাকেন।আর তাওবা না করলে শিরক ও কুফরির কারনে জাহান্নাম ই হবে আমাদের শেষ ঠিকানা।আল্লাহুম্মাগফিরলি।তাই আমাদের শুধু উচিত নয় বরং ফরজ শিরক ও কুফরি সম্পর্কে ইলম অর্জন করা এবং তা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা।

“ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ তা‘আলা যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে ধর্মের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। সহীহঃ ইবনু মা-জাহ (২২০), বুখারী ও মুসলিম।
(জামে আত তিরমিযি ২৬৪৫)

শুধু নিজেদের জন্যই নয় বরং আমাদের নিজেদের পরিবার ,পরিজন,আত্মীয়স্বজন,পাড়া প্রতিবেশী সকলকে এ সকল বিষয়ে সচেতন করা ও তাদেরকেও এসব বিষয়ে ইলম অর্জনের ব্যাপারে তারাও যেন আগ্রহী হয় সে বিষয়ে তাদেরকে নিয়ে তালিম করা এবং আলোচনা জারি রাখা।জুমা বারে খুতবায়,চা এর দোকানে বসে ,পরিবারকে এক সাথে নিয়ে বসে আমরা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি,ইন শা আল্লাহ।

নিজেদের ভুল ত্রূটি সংশোধন ও নিজেদের ইসলাহের জন্য আলেম উলামা ও নেক বান্দাদের সহবতে থাকা অত্যন্ত জরুরী। গুনাহে জর্জরিত এই জীবন ও দুনিয়ায় আল্লাহর সান্যিধ্য অর্জন করাটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।শুধু দরকার কিছুটা মেহনত ও দৃঢ় ইচ্ছা।

আমরা যদি আমাদের রবের সন্তুষ্টী ও তাঁর প্রিয় বান্দা হিসেবে কিয়ামতে আল্লাহ তায়ালার সামনে দন্ডায়মান হতে চাই,তবে আমাদের উচিত আল্লাহ তায়ালার কুরআন কে আকড়ে ধরা,কুরআনে আল্লাহ তায়ালার কথা গুলোকে মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত ও অনুভব করা। হতে পারে তা তাফসির পাঠ করার দ্বারা বা যেকোনো ভাবে।শুধু তিলাওয়াতই নয় ,সেই অনুযায়ী আমল জারি রাখা।সাথে হাবিব মুহাম্মাদ [স] এর সুন্নাহকে জীবনে ধারণ করা।যখন আমরা রাসুল[স] এর সুন্নাহ কে ভালবেসে তা জীবনে প্রয়োগ করব তখন ই আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হয়ে উঠার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব ইন শা আল্লাহ।

আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
দ্বিতীয় দিনে যখন মুসলিমরা আবূ বকর (রাঃ) - এর বায়‘আত গ্রহণ করেছিল এবং তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর মিম্বারের উপর উপবিষ্ট ছিলেন; ‘উমর (রাঃ) - কে আবূ বকর (রাঃ) - এর পূর্বে হামদ ও ছানা ও কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে তিনি (আনাস) শুনেছেন। তিনি বললেন, অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের জন্য তোমাদের কাছে যা ছিল তার চেয়ে তার নিকট যা আছে সেটাকেই পছন্দ করেছেন। আর এই যে সে কিতাব যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - কে হিদায়াত দিয়েছিলেন।কাজেই একে তোমারা আঁকড়ে ধর। তাহলে এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - কে যে হিদায়াত দিয়েছিলেন তোমরাও সেই হিদায়াত পাবে। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৭৬১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৭৭৩) (৩৮৭)

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
সর্বোত্তম কালাম হল আল্লাহ্‌র কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ নির্দেশনা হল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর পথ নির্দেশনা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল নতুনভাবে উদ্ভাবিত পন্থাসমূহ। “তোমাদের কাছে যার ও'য়াদা দেয়া হচ্ছে তা ঘটবেই, তোমরা ব্যর্থ করতে পারবে না” (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৭৬৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৭৮১) (৩৮৮)

দুনিয়ার এই জীবনে মানুষের থেকে অধিক সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ও অভিভাবক হলেন আল্লাহ তায়ালা । আমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে নিজেদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ,সকল সিদ্ধান্ত গ্রহনে আল্লাহ তায়ালার হুকুম গ্রহণ করে থাকি তবেই তা হবে আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত।

আমাদের প্রয়োজন জীবনের সকল বিষয় ছোট থেকে বড় বড় থেকে ছোট সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাকে জানানো, একজন মানুষ হয়ে আমরা কী করে একজন মানুষের কাছেই একজন সৃষ্ট জীবের কাছে নিজেদের চাওয়া পাওয়া গুলো পেশ করে থাকি! যেখানে আমাদের সকল কে, এই পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদেরকে প্রত্যেক রাতে ও দিনে আমাদেরকে তাঁর কাছে আমাদের সকল চাওয়া পাওয়া গুলো পেশ করার জন্য আরজি করতে থাকেন।শুধু তাই নয় তিনি আমাদের চাওয়া পাওয়াগুলোকে উত্তম উপায়ে উত্তম ভাবে আমাদের জীবনে প্রেরন করে থাকেন।

তাই চলুন আমাদের সকল বিষয় সকল কথায় যেন আমরা আল্লাহ তায়ালাকে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রাখতে পারি, জানিয়ে রাখি।কেননা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তায়ালাই হবেন উত্তম সঙ্গী তাদের জন্য, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালাকে ভাল ও মন্দ সময়ে স্মরণ করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালার ফরজ ইবাদত গুলো মনোযোগ সহকারে পালন করার এবং আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হবার জন্য আল্লাহর দ্বীনের সকল বিধি নিষেধ,পছন্দ ও অপছন্দ বিষয় গুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা আমাদের জন্য জরুরি এবং সে অনুযায়ী আমলে অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করা। তবেই আমরা আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের কাতারে সামিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব ইন শা আল্লাহ।

সব শেষে আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করব আমার রব আল্লাহু তায়ালার,যিনি আমাকে আমার আম্মু আব্বুর দুয়া ও আমার বড় ভাই বোনদের সাহায্যের উছিলায় আমাকে এত দূর আসার

এবং এই ইলমের পথে লেগে থাকার তৌফিক দান করেছেন,আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল (আইওএম এর সকল ত্বলিব ত্বলিবা ও উস্তাদ উস্তাজা ও আমাদের পরিবার পরিজনদের) কে তার দ্বীনকে পরিপূর্ণ ভাবে ভালবাসার সহিত মেনে চলার এবং রাসুল (স) এর সুন্নাহকে মহব্বতের সাথে নিজেদের জীবনে পরিপূর্ণভাবে জায়গা করে নেয়ার তউফিক দান করুন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রিয় ও সন্তুষ্টিকর বান্দাদের কাতারে সামিল হবার সৌভাগ্য অর্জন এর তউফিক দান করুন। আমিন সুম্মা আমিন

তথ্যসূত্রঃ

১। সুরা বাকারা ,আয়াত ২৭

২। সুরা বাকার,আয়াত ২৮১

৩। সুরা মারইয়াম আয়াত ৬০

৪। সুরা আলে ইমরান,আয়াত ২৫

৫। সুরা আলে ইমরান ,আয়াত ৩১

৬। সুরা নাযিয়াত ,আয়াত ২৫

৭। মুসলিম, হাদিস: ৬৩৫৭;

৮। সুরা আলে ইমরানে,আয়াত ২৯

৯। সুরা আনকাবুত ,আয়াত ৬৮

১০। সুরা বাকারা আয়াত ৩৯

১১। সুরা বাকারা আয়াত ৩৪

১২। সুরা আনয়াম আয়াত ০৫

১৩। সুরা কাহাফ আয়াত ৩৫-৩৮

১৪। সুরা আহকাফ আয়াত ০৩

১৫। সুরা আনয়াম আয়াত ০৪

১৬। সুরা মুনাফিকুন,আয়াত ০৩

১৭। সুরা মুনাফিকুন আয়াত ০৩

১৮। সহিহ বুখারি ,আস সহিহ ১/২১,৩/১১৬০ মুসলিম,আস সহিহ১/৭৮

১৯। সুরা মুহাম্মাদ আয়াত ৮-৯

২০। সুরা আনয়াম আয়াত ৬৮

২১। সুরা শুআরা আয়াত ০৬

২২। সুরা আলে ইমরান আয়াত ২৮

২৩। সুরা নিসা আয়াত ১৪৪

২৪। সুরা মায়িদা আয়াত ৫১

২৫। সুরা মায়িদা আয়াত ৫৭

২৬। সুরা নিসা আয়াত ১৩৮-১৪০

২৭। সুরা মুজাদালা আয়াত ২২

২৮। সুরা মুমতাহিনা আয়াত ০৮

২৯। সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৯

৩০। সুরা আলে ইমরান আয়াত ৮৫

৩১। সুরা নাহল আয়াত ১২২

৩২। বুখারি ও মুসলিম

৩৩। বুখারি ও মুসলিম

৩৪। তিরমিযি

৩৫। সূরা আনআম-৬৮

৩৬। ফতোয়ায়ে শামি, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৮-৩৪৯

৩৭।ফতোয়া আলমগিরি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৭

৩৮। ফতোয়া আলমগিরি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭৪

৩৯। সহিহ মুসলিম-১৩০

৪০। বুখারি-৬৭৬৮, মুসলিম-১২১

৪১। মুহিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭৭, ফতোয়া হিন্দিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩

৪২। ফতোয়া আলমগিরি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৩

৪৩। মাজমুউল আনহুর শরহে মুলতাকাল আবহার প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৯১

৪৪। সূরা নিসা-১৪০

৪৫। ফতোয়া হিন্দিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৭

৪৬। কাফিয়াতুল আখয়ার ফি হাল্লে গায়েতিল ইখতিছার, পৃষ্ঠা-৪৯৪

৪৭। আল বাহরুর রায়েক, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩১

৪৮। বুখারি, হাদিস : ৫৭১৭

৪৯। ফাতাওয়ায়ে বাজ্জাজিয়া ৬/৩৩৩

৫০। রদ্দুল মুহতার ৪/২২৩

৫১। ফাতাওয়ায়ে বায্যাযিয়া ৬/৩৩৭

৫২। আল-বাহরুর রায়েক : ৫/১২৩

৫৩। আল-বাহরুর রায়েক : ৫/১২০

৫৪। খুলাসাতুল ফাতাওয়া : ৪/৩৮৬

৫৫। বুখারি, হাদিস : ১২৭

৫৬। সুরা মু’মিনুন আয়াত ২৪-২৫

৫৭। সুরা ফুরকান আয়াত ০৪

৫৮। সুরা ফুরকান আয়াত ৭-৮

৫৯। সুরা : আহজাব, আয়াত : ৪০

৬০। সহিহ মুসলিম ২২৩০

৬১। সুরা বাকারা আয়াত ৮৭

৬২। সহিহ মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নং ৬৮০৮

৬৩। আল ফিকহুল আকবর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা

৬৪। সহিহ বুখারি হাদিস ৫০, সহিহ মুসলিম হাদিস ০৯, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস ৬৪, সুনানে নাসায়ি হাদিস ৪৯৯১

৬৫। সুরা বাকারা আয়াত ২১২

৬৬। সুরা বাকারা আয়াত ৮১

৬৭। সুরা আলে ইমরান আয়াত ৫৬

৬৮। সুরা বাকারা আয়াত ২১২

৬৯। সুরা মুলক আয়াত ২৭

৭০। সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৯

৭১। সুরা বাইয়্যেনাহ আয়াত ০৬

৭২। সুরা আরাফ আয়াত ৯৬

৭৩। সুরা নাহল আয়াত ১৪

৭৪। বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৮৩ (কিতাবুল আম্বিয়া, বাবু আম হাসিবতা...); মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২১১০ (কিতাবুত তাওবা, বাবুন ফী সাআতি রাহমাতিল্লাহ)

৭৫। বুখারী *আস-সহীহ ৩/১২১৯, ১৩২১, ৪/১৫৮১, ১৭১৪, ৫/২২৮১, ৬/২৫৪০, ২৭০২; মুসলিম, আস-সহী হ ২/৭৪১-৭৪৪*

৭৬।*ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩৪৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৫২০, ৫৮৭; ইবনু কাসীর, আন-নিহায়াতু ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিম ১/১০; বুসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ ৪/১৯৪; আলবানী, সাহীহাহ ১/৮৭ সহীহু সুনানি ইবন মাজাহ ২/৩৭৮*

৭৭। ইসলামের নামে জাঙ্গিবাদ ও কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

৭৮। *ইবন তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩/২৮২- ২৮৬*

৭৯। ইবন তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩/২৩১

৮০। ইবন তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ৩/২২৯

৮১। ইবনু আবেদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ১/৫৬১

৮২।*আব্দুল হাই লাখনবী, আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ, ইমাম মুহাম্মাদের মুআত্তাসহ ৩/৪০৪*

৮৩।মোল্লা আলী কারী, মিরকাতুল মাফাতীহ ১/৩০৬ (কিতাবুল ঈমান, ঈমান বিল কাদার

৮৪। সূরা (২১) আম্বিয়া: ৮৭ আয়াত

৮৫। সূরা (১২) ইউসূফ: ৯৭ আয়াত

৮৬।সূরা (৪৮) ফাতহ: ২ আয়াত

৮৭। ইমাম আবূ হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ৫৫-৫৬

৮৮। ইমাম আবূ হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ৪৫-৪৬

৮৯। সূরা (৫) মায়িদা: ৮ আয়াত

৯০। *ইমাম আবূ হানীফা, আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, পৃ. ৩২*

৯১। সূরা (৬) আনআম: ১০২ আয়াত

৯২। সূরা (২২) হাজ্জ: ৭৮ আয়াত; সূরা (৫৮): ১৩ আয়াত

৯৩। *সূরা (২) বাকারা: ১৮৩ আয়াত*

৯৪। সূরা (৩০) রূম: ১৭-১৮ আয়াত

৯৫। ইমাম আবূ হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃ. ৪২-৪৩

৯৬। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-মুআত্তা ৩/৪০৪

৯৭। আল ফিকহুল আকবার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা

৯৮। *আল হামাসাহ আল মাগরিবিয়্যাহ, পৃ. ১২৪ (আল মাকতাবাতুশ শামিলাহ]*

৯৯। ই'য়ানাতুত্ তালিবীন 'আলা হাল্লি আলফাযি ফাতহিল মু'ঈন, খ. ২, পৃ. ১৬৭

১০০। সূরা আল আ'রাফ ৭ : ১৭৫-১৭৬

১০১। সহীহ, ইবনু মাজাহ ২২০, বুখারি ও মুসলিম, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ২৬৪৫ [আল মাদানী প্রকাশনী]

১০২। *সুনান ইবনু মাজাহ : ৪০২২, মুসনাদ আহমাদ : ২২৪১৩; মিশকাত : ৪৯২৫, হাদীসটির প্রথমাংশ হাসান লিগাইরিহী, তবে শেষাংশের ইসনাদ য'ঈফ*

১০৩।সূরা আন্ নাহল ১৬ : ২১

১০৪। সুরা ফুরকান আয়াত ৪৪

১০৫। সূরা আর্ রূম ৩০ : ৪১]

১০৬। *সুনান ইবনু মাজাহ : ৪০১৯, হাদীসটির সনদ হাসান*

১০৭। সুরা হাজ্জ্ব আয়াত ৫৫

১০৮। সুনান আবূ দাঊদ : ৪২৯৯, মুসনাদে আহমাদ : ২২৩৯৭, হাদীসটি সহীহ

১০৯। সহীহুল বুখারী : ৬১২০

১১০। সহীহুল বুখারী : ৯

১১১। সুরা ফাতির আয়াত ০৮

১১২। সুরা আর রুম আয়াত ৫৮-৫৯, ১সুরা আয যাসিয়া আয়াত ২৩

১১৩। সুরা কাহাফ আয়াত ৫৭

১১৪। সুরা আম্বিয়া আয়াত ৩৬

১১৫। সুরা মু'মিনুন আয়াত ১১০

১১৬। গুনাহ মাফের উপায় ,প্রথম অধ্যায়; গুনাহ পরিচিতি

১১৭। সুরা আন নামাল আয়াত ০৪

১১৮। সুরা আন নামাল আয়াত ২৪

১১৯। সুরা আন নামাল আয়াত ৬৭-৬৮

১২০। সুরা ত্ব হা আয়াত ৫৫

১২১। সুরা রোম আয়াত ১৯

১২২। সুরা আম্বিয়া আয়াত ৩৪

১২৩। সুরা হাজ্জ্ব আয়াত ৬৬

১২৪। সুরা আনকাবুত আয়াত ৫৩-৫৫

১২৫। সুরা সাবা আয়াত ০৩

১২৬। সুরা আলে ইমরান আয়াত ১০

১২৭। সুরা বাকারা আয়াত ৮০

১২৮। ১সুরা সাবা আয়াত ৩৫

১২৯। সুরা ইয়া সীন আয়াত ৪৯-৫২

১৩০। ১সুরা মু’মিনুন আয়াত ৯৯

১৩১। ১সুরা ফুরকান আয়াত ২২,২৩

১৩২। সুরা আম্বিয়া আয়াত ৩৫

১৩৩। ১সুরা কাহাফ আয়াত ৩০-৩১

১৩৪। সুরা নূর আয়াত ৩৯

১৩৫। সূরা হুদ: ১৫–১৬

১৩৬। সূরা আশ-শূরা; ২০

১৩৭। সূরা আল ফুরকান: ২৩

১৩৮। তাফসীরে জাকারিয়া

১৩৯। সুরা মু’মিনুন আয়াত ৪০

১৪০। তাফসীরে আহসানুল বায়ান

১৪১। সুরা ফুরকান আয়াত ২৭

১৪২। সুরা ফাতির আয়াত ৩৭

১৪৩। সুরা কাহাফ আয়াত ১০৬

১৪৪। সুরা আসাবা আয়াত ৪২

১৪৫। সুরা আহযাব আয়াত ৬৪

১৪৬। সুরা ফুরকান আয়াত ৬৯

১৪৭। সুরা ক্বসাস আয়াত ৯০

১৪৮। সুরা নূর আয়াত ৫৭

১৪৯। সুরা আম্বিয়া আয়াত ৩৯

১৫০। সুরা ফাতির আয়াত ৩৯

১৫১। তাফসীরে আহসানুল বায়ান

১৫২। সুরা ক্বসাস আয়াত ৬৩-৬৬

১৫৩। সুরা রোম আয়াত ১৩

১৫৪। সুরা ফাতির আয়াত ১৮

১৫৫। সুরা আহযাব আয়াত ৬৬

১৫৬। সুরা ফুরকান আয়াত ৩৪

১৫৭। সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ০৮

১৫৮। ১সুরা হাজ্জ্ব আয়াত ১৯-২২

১৫৯। সুরা মু'মিনুন আয়াত ১০৪

১৬০। সুরা আদ দুখান আয়াত ৪৩-৫০,সুরা আল ওয়াকিয়াহ আয়াত ৫২-৫৬

১৬১। সুরা গাশিয়া আয়াত ০৪-০৭,সুরা ইবরাহিম আয়াত ১৬-১৭

১৬২। সুরা ইবরাহিম আয়াত ৫০

১৬৩। সুরা জুমার আয়াত ৫৬-৫৮

১৬৪। সুরা মু'মিনুন আয়াত ১০৭-১০৮

১৬৫। সুরা জুমার আয়াত ৫৯

১৬৬। সুরা মু'মিন আয়াত ১০-১২

১৬৭। সুরা হা মিম সাজদাহ আয়াত ১৯-২১

১৬৮। সুরা জুমার আয়াত ৭১-৭২

১৬৯। সুরা যাসিয়া আয়াত ৩৫

১৭০। সুরা মু'মিন আয়াত ৭১-৭৫,সুরা আল ক্বমার আয়াত ৪৮-৪৯

১৭১। সুরা মাদ্দাসসির আয়াত ২৬-৩০

১৭২। সুরা ক্বসাস আয়াত ০৪

১৭৩। ইবনে কাসীর

১৭৪। তাফসীরে আহসানুল বায়ান

১৭৫। সুরা ক্বসাস আয়াত ৩৬

১৭৬। সুরা ক্বসাস আয়াত ৩৯-৪২

১৭৭। সুরা ক্বসাস আয়াত ৭৬,৭৮,৭৯

১৭৮। সুরা ক্বসাস আয়াত ৮১

১৭৯। সুরা আনকাবুত আয়াত ৩৯

১৮০। সুরা আন নামাল আয়াত ৫৪

১৮১। সুরা আনকাবুত আয়াত ২৮

১৮২। সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৭৩-৭৭

১৮৩। সুরা আন নামাল আয়াত ৫৫-৫৮

১৮৪। সুরা আনকাবুত আয়াত ২৯

১৮৫। সূরা হূদ, আয়াত: ৮২-৮৩

১৮৬। সুরা আনকাবুত আয়াত ৩৪

১৮৭। সুরা আনকাবুত আয়াত ৩৬-৩৭

১৮৮। সুরা সাবা আয়াত ১৫-১৭

১৮৯। সুরা আনকাবুত আয়াত ৪০

১৯০। সহিহ মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নং ৬৭৯৪

১৯১। সুরা আল ক্বমার আয়াত ০৯-১৪

১৯২। সুরা আল হাক্কাহ আয়াত ০৪-০৮

১৯৩। সুরা বাকারা আয়াত ২০৮

১৯৪। সুরা আলে ইমরান আয়াত ৩১

১৯৫। সুরা বাকারা আয়াত ২৫৭

১৯৬। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৭০১, ইসলামিক সেন্টার ৬৭৫৬

১৯৭। সহিহ মুসলিম হাদিস একাডেমি, হাদিস নং ৬৮৪৬

১৯৮। সুরা বাকারা আয়াত ২২২

১৯৯। সুরা আলে ইমরান আয়াত ৯১

২০০। সুরা আলে ইমরান আয়াত ৮৬ ,৮৯

২০১। সুরা বাকারা আয়াত ১৬০

২০২। সুরা নূর আয়াত ৩১

২০৩। ২সুরা বাকারা আয়াত ২৮৪

২০৪। সুরা আলে ইমরান আয়াত ৭৪

২০৫। সুরা জুমার আয়াত ৫৩

২০৬। সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৩৫

২০৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৭১৬, ইসলামিক সেন্টার ৬৭৭২

২০৮। সহিহ মুসলিম হাদিস নং, ৬৮৬২

২০৯। সুরা বাকারা আয়াত ২৭৭

২১০। বুখারী ৬৩০৭,তিরমিযি ৩২৫৯,ইবনে মাযাহ ৩৮১৬,মুসনাদে ইমাম আহমাদ ৭৭৩৪,৮২৮৮,৯৫১৫

২১১। সুরা মু'মিন আয়াত ০৩

২১২। হাদিসটি সহিহ। ইবনে মাযাহ ৩৩-কিতাবুল আদব,হাদিস নং ৩৮১৮

২১৩। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৭৩২, ইসলামিক সেন্টার ৬৭৮৭

২১৪। ২সহিহ মুসলিম হাদিস নং ৬৮৭৯

২১৫। সুরা বাকারা আয়াত ২৭১

২১৬। সুরা বাকারা আয়াত ২৭৪

২১৭। সুরা ফাতির আয়াত ২৯

২১৮। মুসলিম শরিফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নং ২২৫২

২১৯। সুরা বাকারা আয়াত ২৬২

২২০। সুরা বাকারা আয়াত ২৬১

২২১। সুরা আরা'ফ আয়াত ২৩

২২২। সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৬

২২৩। সুরা নূহ আয়াত ২৮

২২৪। সূরা-শুআ'রা : ৮৩-৮৭

২২৫। সূরা-মুমতাহিনা : ৫

২২৬। সূরা-আল-ইমরান : ১৪৭

২২৭। ২সূরা- মুমিনুন : ১১৮

২২৮। সূরা-বাকারা : ২০১

২২৯। সূরা-বাকারা : ২৮৬

২৩০। সূরা-আল-ইমরান: ৮

২৩১। সূরা-ফুরকান:৭৪

২৩২। সুরা হাশর আয়াত ১০

২৩৩। সূরা-তাহরীম : ৮

২৩৪। সূরা-আল-ইমরান : ১৬

২৩৫। সুরা-ইব্রাহীম : ৩৫

২৩৬। সূরা আরাফ : ৪৭

২৩৭। সূরা- তাওবা : ১২৯

২৩৮। সুরা বাকারা আয়াত ২৮৬

২৩৯। সুরা শুয়ারা আয়াত ৮৩-৮৭

২৪০। সুনান ইবনু মাজাহ : ৪২৫২, সহীহ ইবনু হিব্বান : ৬১৪, সহীহুত্ তারগীব : ৩১৪৬-৩১৪৭, হাদীসটি সহীহ

২৪১। সহীহুল বুখারী : ৬০৬৯; সহীহ মুসলিম : ৭৬৭৬

২৪২। সহীহুল বুখারী : ৭৫০৭; সহীহ মুসলিম : ৭১৬২

২৪৩। আলে ইমরান আয়াত ১৩৫

২৪৪। মুসনাদ আহমাদ : ৭০৪১; আল আদাব আল মুফরাদ : ৩৮০; শু'আবুল ঈমান : ৭২৩৬; আস্ সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ : ৪৮২

২৪৫। সূরা আন্ নিসা ০৪ : ১৭-১৮

২৪৬। মুসনাদ আহমাদ : ৬১৬০; জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৫৩৭; হাদীসটি হাসান, সহীহুত তিরমিযী : ২৮০২

২৪৭। মুসনাদ আহমাদ : ৬১৬০; জামি' আত্ তিরমিযী : ৩৫৩৭; হাদীসটি হাসান, সহীহুত তিরমিযী : ২৮০২

২৪৮। সূরা আল আন্‘আম ০৬ : ১৫৮

২৪৯। সুনান আবূ দাঊদ : ২৪৮১, হাদীসটি সহীহ

২৫০। সহীহ মুসলিম : ৭০৩৬

২৫১। সহীহুল বুখারী : ২৪৪৯; জামি‘ আত্ তিরমিযী : ২৪১৯

২৫২। বই-গুনাহ মাফের উপায়

২৫৩। সুরা নিসা আয়াত ১৪৪

২৫৪। সুরা মায়িদ আয়াত ৫৭

২৫৫। সুরা মুমতাহিনা আয়াত ১৩

২৫৬। সুরা আলে ইমরান আয়াত ১১৮

২৫৭। সুরা আলে ইমরান ১১৯

২৫৮। সুরা আলে ইমরান আয়াত ১২০

২৫৯। তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৭৮

২৬০। সুরা আলে ইমরান আয়াত ২৮

২৬১। সুরা মায়িদা আয়াত ৫১

২৬২। সুরা যুখরূফ আয়াত ৬৭

২৬৩। সুরা আয যাসিয়া আয়াত ১৯

২৬৪। সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১০২

২৬৫। সহীহ, সহীহাহ (২৪৩৯)

২৬৬। হাসান, সহীহাহ (১৫৪)

২৬৭। যইফ, ইবনু মাজাহ ৩৪৩৭, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ২০৬৫ [আল মাদানী প্রকাশনী]

২৬৮। বুখারি শরিফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নং ৫৩৫৭

২৬৯। হাসান সহীহ, তাহকিক মিশকাত ছানী ৪২৩৫, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ২০৬৬ [আল মাদানী প্রকাশনী]

২৭০। হাসান সহীহ, তাহকিক মিশকাত ছানী ৪২৩৫, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ২০৬৬ [আল মাদানী প্রকাশনী]

২৭১। বুখারি শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নং ৫৩২৪,৫৩৪০

২৭২। ২বুখারি শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নং ৫৩২৫

২৭৩। বুখারি শরিফ হাদিস নং ৫৩৩২

২৭৪। মুসলিম, হাদিস : ৭৮০

২৭৫। বুখারি, হাদিস : ২৩১১

২৭৬। হাদিস টি হাসান গরিব [তিরমিযি হাদিস নং২৮৮০]

২৭৭। সুরা নিসা আয়াত ৮২

২৭৮।সুরা আল ক্বমার আয়াত ৪০

২৭৯। সুরা বাকারা আয়াত ৬৬

২৮০। সুরা মুজ্জাম্মিল আয়াত ২০

২৮১। সুরা ইউসুফ আয়াত ১১১

২৮২। সুরা নিসা আয়াত ১৬২

২৮৩। সুরা নিসা আয়াত ১০৩

২৮৪। সুরা বাইয়্যেনাহ আয়াত ০৫

২৮৫। সুরা বাকারা আয়াত ২৩৮

২৮৬। সহিহ বুখারি ২৭৮২

২৮৭। সুরা আলে ইমরান আয়াত ৩৮

২৮৮। সুরা মু'মিন আয়াত ৫৫

২৮৯। সুরা রাদ আয়াত ২৮

২৯০। সহিহ বুখারি হাদিস নং ২৭৯৪

২৯১। সুরা মুজ্জাম্মিল আয়াত ০৮

২৯২। সুরা মুনাফিকুন আয়াত ০৯

২৯৩। সুরা মু'মিনুন আয়াত ৭৮

২৯৪। সুরা মু'মিন আয়াত ৬১

২৯৫। সুরা আলে ইমরান আয়াত ১০৩

২৯৬। সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৯০

২৯৭। সুরা আশ শামস আয়াত ০৯

২৯৮। সুরা আন নাযিয়াত আয়াত ৪০-৪১

২৯৯। সুরা আশ শুরা আয়াত ৩৭

৩০০। সুরা নিসা আয়াত ৩১

৩০১। সুরা আয যাসিয়া আয়াত ০৫

৩০২। সুরা আয যাসিয়া আয়াত ১৩

৩০৩। আবু দাউদ

৩০৪। সূরা হাশর, আয়াত ১৮

৩০৫। সুরা তাওবা আয়াত ১৪

৩০৬। সুরা তাওবা আয়াত ৮৮

৩০৭। সুরা স্বফ আয়াত ১১

৩০৮। সুরা হাদিদ আয়াত ১৯

৩০৯। সুরা নিসা আয়াত ৬৯

৩১০। সূরা ফাতহ, আয়াত ২৯

৩১১। সূরা মায়িদাহ, আয়াতঃ ৫৫

৩১২। আবু দাউদ

৩১৩। সুরা আলে ইমরান আয়াত ৯০

৩১৪। সুরা নাহল আয়াত ১০৬

৩১৫। সুরা নিসা আয়াত ১৮

৩১৬। সুরা আলা মুনাফিকুন আয়াত ০৩

৩১৭। সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নং ৪১০৫

৩১৮। সুরা হুদ আয়াত ১৫

৩১৯। সুরা ইবরাহিম আয়াত ০৩

৩২০। সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ১৮

৩২১। ৩সুরা তাওবা আয়াত ১১৯

৩২২। সুরা ইউনুস আয়াত ৬৩-৬৪

৩২৩। সুরা নাহল আয়াত ১২৮

৩২৪। সহিহ বুখারি হাদিস নং ৩৪৯০

৩২৫। সুরা মারইয়াম আয়াত ৬৩

৩২৬। সুরা তাওবা আয়াত ১০৫

৩২৭। সুরা তাওবা আয়াত ১১২

৩২৮। সহিহ মুসলিম ৬৮৫০

৩২৯। সহিহ মুসলিম হাদিস নং ৬৮৫৩

৩৩০। সহিহ বুখারি হাদিস নং ৫৩৫১

৩৩১। সুরা হুদ আয়াত ১১৩

৩৩২। সুরা ইবরাহিম আয়াত ১৩

৩৩৩। সুরা রাদ আয়াত ২০-২৩

৩৩৪। সুরা হুদ আয়াত ৮৫

৩৩৫। সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ৩৫

৩৩৬। সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ২৩-২৪

৩৩৭। সুরা আনকাবুত আয়াত ০৮

৩৩৮। সহিহ বুখারী হাদিস নং ৫৯৭৫

৩৩৯। সহিহ বুখারি হাদিস নং ৫৯৭০

৩৪০। সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ২৬-২৭

৩৪১। সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ৩১

৩৪২। সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ৩২

৩৪৩। সুরা বাকার ২০৮

৩৪৪। সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ৩৭

৩৪৫। সুরা নাহল আয়াত ৯০

৩৪৬। সুরা বাকারা আয়াত ১৭৭

৩৪৭। সুরা মারইয়াম আয়াত ৭৬

৩৪৮। সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ৪৫-৪৬

৩৪৯। সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ৭৮

৩৫০। সুরা বনি ইসরাইল আয়াত ৫৩

৩৫১। সুরা ত্বহা আয়াত ১৩২

৩৫২। সুরা যুমার আয়াত ৬১

৩৫৩। সুরা বাকারা আয়াত ১৮৯

৩৫৪। সুরা বাকারা আয়াত ১৯৭

৩৫৫। সুরা মারিয়াম আয়াত ৭২

৩৫৬। সুরা আম্বিয়া আয়াত ১৯-২০

৩৫৭। সুরা হাজ্জ আয়াত ৩৫

৩৫৮। সুরা বাকারা আয়াত ১৭৭

৩৫৯। সুরা বাকারা আয়াত ৪৫

৩৬০। সুরা হাজ্জ আয়াত ৫০

৩৬১। সুরা হাজ্জ আয়াত ৭৭

৩৬২। সুরা আনকাবুত আয়াত ০৯

৩৬৩। সুরা মুমিনুন আয়াত ০৮-১১

৩৬৪। সুরা লোকমান আয়াত ০৮

৩৬৫। সুরা আন নুর আয়াত ৩১

৩৬৬। সুরা আহযাব আয়াত ৩২-৩৩

৩৬৭। সুরা আন নুর আয়াত ৩১

৩৬৮। সুরা আন নূর আয়াত ৬০

৩৬৯। সুরা নুর আয়াত ৩০

৩৭০। সুরা আহযাব আয়াত ৩৫

৩৭১। সুরা বাকারা আয়াত ২১৬

৩৭২। সুরা আন নিসা আয়াত ৭৭

৩৭৩। সুরা আন নিসা আয়াত ৯৫

৩৭৪। সুরা বাকারা আয়াত ৩-৫

৩৭৫। সুরা আলে ইমরান আয়াত ২৮

৩৭৬। সুরা আনফাল আয়াত ০৩-০৪

৩৭৭। সুরা তাওবা আয়াত ৭১

৩৭৮। সুরা তাওবা আয়াত ১১২

৩৭৯। সুরা রাদ আয়াত ২০-২৩

৩৮০। সুরা মুমিনুন আয়াত ৫৭-৬১

৩৮১। সুরা হাজ্জ আয়াত ৩৫

৩৮২। ৩সুরা ফুরকান আয়াত৬৩-৬৭

৩৮৩। সুরা ফুরকান আয়াত ৬৮-৭০

৩৮৪। সুরা ফুরকান আয়াত ৭১-৭৫

৩৮৫। সুরা আন নেসা আয়াত ৭৪

৩৮৬। সুরা আন নিসা আয়াত ৭৬

৩৮৭। সহিহ বুখারি হাদিস নং ৭২৬৯

৩৮৮। সহিহ বুখারী হাদিস নং ৭২৭৭.